৪র্থ বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩২১

[illegible]

[illegible] পৌষ ১৩২১ [illegible] ৯ম সংখ্যা।

বীরভূমি

মাসিকপত্রিকা।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

[illegible]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী

শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা-বিজয়ের সময় সাগর-বন্ধন কার্য্যে যখন মহারথী রথী প্রভৃতি বড় বড় বীরগণ ব্যাপৃত, তখন অতি ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিড়াল অকিঞ্চৎকর হইলেও যেমন তাহার সাধ্যানুরূপ চেষ্টায় সে কার্য্যের সহায়তায় অগ্রসর হইয়াছিল, অদ্যকার এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সুমহান কার্য্যে যখন দেশের ও সমাজের অগ্রণী মহাজনেরা বদ্ধপরিকর হইয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মঙ্গল কামনায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, এই দীনাতিদীন, নগণ্য ও অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহার সাধ্যানুরূপ চেষ্টা, ব্যাকুলতা ও ভরসা লইয়া ভক্তমণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত। সাগরবন্ধনের সময় বিপুলায়তন গগন-ভেদী গিরিশৃঙ্গ সকল যখন মহা মহাবীরের দ্বারা বাহিত হইতেছিল, ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিড়াল তাহার অতি ক্ষুদ্রদেহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকণা বহন করিয়াও শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা লাভ করিয়াছিল। এ দীন হীন ও আজ সেই ভরসায় বুক বাঁধিয়া ভক্তমণ্ডলীর সমীপে উপস্থিত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর ২য় বার্ষিক কার্য্য নির্দ্ধারণ সমিতির আলোচ্য বিষয়ের ৮ম বিষয়টি এই :—"বৈষ্ণব তীর্থরক্ষা ও রুগ্ন প্রভৃতি নিরাশ্রয় বৈষ্ণবগণের জন্য শ্রীধাম নবদ্বীপাদি তীর্থ স্থানে সেবাশ্রম স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা হউক।"

সন ১৩১৮ সালের ৯ই ফাল্গুন তারিখে শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব মহোদয়ের শিষ্যগণের দ্বারা শ্রীধাম নবদ্বীপে "রাধারমণ সেবাশ্রম" স্থাপিত হইয়াছে। প্রায় দুই বৎসর কাল পীড়িত, সাধু, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, ভক্ত ও নিরাশ্রয়ের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা ; আর্ত্ত, স্থবির ও অক্ষমদিগকে আশ্রমে

রাখিয়া সেবা ; নিরাশ্রয় মৃতের যথাবিধি সৎকার ; অনাথ বালক বালিকা-দিগকে আশ্রমে রাখিয়া বর্ণাশ্রমোপযোগী শিক্ষা দান প্রভৃতি কার্য্য সাধ্যানুরূপ করা হইতেছে।

এ দীন দাস "রাধারমণ সেবাশ্রম"এর কার্য্যে প্রায় দুই বৎসর কাল ব্যাপৃত থাকিয়া বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে এক সংশয়াপন্ন স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে ইহা অনুভব করিয়া, যে ভাবনা, যে নিস্ফলতার আশঙ্কা হৃদয়ে জন্মিয়াছে, সম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থকতা দিবার যে আকুলতা প্রাণে উদয় হইয়াছে তাহারি তাড়নায় আজ আপনাদের সম্মুখে অকপটে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিতে উপস্থিত। আমাদের আশঙ্কা যদি মিথ্যা হয় তাহাও সাধারণের নিকট হইতে বুঝিবার সম্পূর্ণ আশা আছে। বুঝিবার ও হৃদয় বেদনা বুঝাইবার আশা আছে বলিয়াই আজ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জগন্মঙ্গল প্রেমের ধর্ম্মই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবলম্বনীয় ধর্ম্ম। যাঁহার আবির্ভাবে ও যে ধর্ম্মের প্রভাবে বঙ্গদেশ এমন একটী গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিল, যাহা অলোক-সামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলা-দেশের—যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত ভারতে বিস্তারিত হইয়াছিল। যে প্রেমের ধর্ম্ম এক সুমহান ভাবের উচ্ছ্বাসে সমাজের তৎকালীন সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া, তাহাকে প্লাবিত করিয়া, সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক সুমহান্ আনন্দের মধ্যে সকলকে নিস্কৃতিদান করিয়াছিল। সমাজ-শক্তি যখন সকলকে পেষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়া, "মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন", এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, প্রেমের সাধনায় সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনার খেলা ঘরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল—এমন কি প্রেমের স্পর্দ্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্য্যকে পর্য্যন্ত উপহাস করিয়াছিল। ইহাতে তৎকালীন সমাজে যাহারা তৃণাদপি নীচ তাহারাও গৌরব লাভ করিয়াছিল, যাহার স্কন্ধে ভিক্ষার ঝুলি সেও সম্মান লাভ করিয়াছিল, যে স্বেচ্ছাচারী সেও পবিত্র হইয়াছিল। তৎকালীন বাংলার হৃদয় রাজার পীড়ন ও সমাজের শাসনের উপরে উঠিয়া সকল অবস্থার দাসত্ব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া নিখিল জগৎসভার মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। প্রেমের অধিকারে, সৌন্দর্য্যের অধিকারে, ভগবানের অধিকারে,

সকলের সকল বাধা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। কিন্তু আজ ৪২৭ বৎসরের মধ্যেই সে ভাবোচ্ছ্বাস সে হৃদয়ের উন্মেষ, সে মহানুভবতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় হইতে অন্তর্হিত হইল কেন? ইহাই আজ আমাদের ভাবিবার কথা।

প্রেমের সাধনায় বিকার আশঙ্কা আছে আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তাহাই ঘটিয়াছে। প্রেমের একটি দিক আছে যেটি প্রধানতঃ রসের দিক। তাহারি প্রলোভনে জড়িত হইয়া রসসম্ভোগকেই সাধনার চরম সিদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিয়া আজ আমরা কর্ম্মের কঠোরতা, জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলিয়াছি। কর্ম্ম বন্ধন, জ্ঞান শুষ্কতত্ত্ব মাত্র, তাহা প্রেম ভক্তির অন্তরায় এই সকল কথা কেবল কথামাত্র নয়, এইরূপ জীবনই আজ কাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়। প্রেমের সাধনায় কর্ম্মকে বিস্মৃত হইয়া জ্ঞানকে অমান্য করিয়া, কেবল রসসম্ভোগকেই সাধনার চরম সিদ্ধি বলিয়া জানিয়া ও তদনুরূপ কার্য্য করিয়া আমাদের হইয়াছে এই যে গাছকে কাটিয়া ফেলিয়া কেবল ফুলটি লইবার প্রত্যাশা। গাছকে তাচ্ছিল্য করিয়া ফুল লইবার চেষ্টা করিলে কিছু ক্ষণের জন্য ফুলকে পাওয়া যায় বটে কিন্তু নিত্য নব নব ফুল ফুটিবার আর আশা থাকে না। কেবল মাত্র ফুলটীর প্রতি একান্ত লক্ষ্য করিলে তাহার প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করা হয়। যে প্রেমে মঙ্গল্য কর্ম্মের ব্যাকুলতা নাই, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা নাই, সেই প্রেম সংসারজালজড়িত মূঢ় প্রেম, পশুদের সংস্কারগত অন্ধ প্রেম। সত্য প্রেমের দৃষ্টি জাগ্রত, চিত্ত উন্মুক্ত তাহাতে সংযম, সুবিবেচনা ও সৌন্দর্য্যের চিরস্থিতি। প্রেমের সাধনায় কেবল মাত্র রসের দিকটায় ঝুঁকিয়া পড়ায় আমরা কেবল ধ্যানের মধ্যে পরিসমাপ্তির দিক দিয়াই রস-স্বরূপকে দেখিতে পাই। বিশ্বব্যাপারের নিত্য পরিণতির দিক দিয়া দেখিতে পাই না। ধর্ম্মকে আমরা আংশিক করিয়া, খণ্ডিত করিয়া, সুদূর করিয়া, সম্প্রদায়গত, মন্ত্রগত, বিশেষ অনুষ্ঠানগত করিয়া দেখি; তাহাকে পূজার বিষয় বলিয়া জানি, ব্যবহারের সামগ্রী বলিয়া মনে করি না। অথচ সংসারে যাহা একমাত্র সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে যাহা একমাত্র মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্য তাহার অন্তরভূত—তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের

ছোট বড় অন্তর বাহির সর্ব্বাংশের পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুমহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সংসারে যেমন এক একটী প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপযোগী এক একটী ভোগ্য বিষয় আছে, ধর্ম্মকে আমরা সেইরূপ ভক্তি প্রবৃত্তির বিলাস পরিতৃপ্তির উপযোগী ক্ষণকালীন ভোগায়োজন বলিয়া জানি। সেই সময়টা বক্তৃতা, সঙ্গীত, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি দ্বারা একটা ভাবাবেগ উৎপাদন করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিলাম বলিয়া একটা আরাম অনুভব করি, এবং পরক্ষণেই সংসারে প্রবেশ করিয়া সেই ক্ষণিক সংযম, সেই ভক্তিবৃত্তির ক্ষণিক উদ্গমের আশপাশ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া সর্ব্ব প্রকার শৈথিল্যের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকি। এই জন্যই আমাদের সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততায় দুর্গতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেম যখন সত্য হইতে—জ্ঞান হইতে—ভ্রষ্ট হইয়া, কর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া প্রমত্ত বেড়ায়. তখন তাহার সংযম ও ধৈর্য্য নষ্ট হয়, তাহার কল্পনা-বৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে কষ্ট করে; নিজেকে শ্রীহীন বিকৃত করিয়া তুলে। তখন আমাদের বিশ্বাস কোন নিয়মকে মানে না; আমাদের কল্পনায় কিছুই বাধা থাকে না, আমাদের আচারকে কোন প্রকার যুক্তির কাছে কিছু মাত্র জবাবদিহি করিতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ হইতে ভগবানকে অবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতে করিতে শুষ্ক প্রস্তর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয় কেবল মাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই শ্রীভগবানকে অব-রুদ্ধ করিয়া ভোগ করিবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে চায় না; স্থানু হইয়া বসিয়া আপনাকে আপনি নিরীক্ষণ করিতে চায়, আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করিতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনের ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতে চায়। ইহাতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কতদূর বিকৃতি ও দুর্ব্বলতা ঘটে তাহা পরিমাণ করিবার উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখি না। আমরা তখন আমাদের অন্তর বাহিরের সামঞ্জস্য হীন বিবেক দিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম. ইতিহাস পুরাণ, সমাজ সভ্যতা সমস্তকে পরিমাপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি, সত্য নির্ণয় করিবার কোন আবশ্যক দেখি না। কিন্তু ইহা আমাদের বোঝা উচিত যে আধ্যাত্মিকতা অন্তর বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের একদিকে নিয়ম, অন্যদিকে আনন্দ।

তাহার একদিকে ধ্বনিত হইতেছে "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি", আর একদিকে ধ্বনিত হইতেছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে"। এক-দিকে বন্ধনকে না মানিলে অন্যদিকে মুক্তিকে পাইবার উপায় নাই। শ্রীভগবান একদিকে নিজের সত্যের দ্বারা বদ্ধ আর একদিকে আপ-নার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধন কর্ম্মকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি, তখনি মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি। কর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া নয়, আমাদের প্রতিদিনের কর্ম্মকেই চিরদিনের সুরে ক্রমশঃ বাঁধিয়া তুলিবার সাধ-নাই সত্যের সাধনা—ধর্ম্মের সাধনা—প্রেমের সাধনা। এই সাধনার মন্ত্র "যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ"—যে যে কর্ম্ম করিবে সমস্তই ব্রহ্মকে অর্পণ করিবে, অর্থাৎ সমস্ত কর্ম্মের দ্বারা মানবাত্মা আপনাকে ব্রহ্ম নিবেদন করিবে ইহাই আত্মার মুক্তি। তখন কি আনন্দ যখন সকল কর্ম্মই শ্রীভগবানে সমর্পিত। কর্ম্ম যখন আমাদের প্রবৃত্তির কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া না আসে, কর্ম্মে যখন আমাদের আত্মনিবেদন প্রতিদিন একান্ত হইয়া উঠে—সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ,— তখন সংসারইত আনন্দ-নিকেতন।

কর্ম্মের মধ্যে মানুষের এই যে আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই যে নিরন্তর আত্ম-নিবেদন, গৃহ কোণে বসিয়া কে ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারে? সমস্ত মানব সন্তান জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে যে প্রেমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এ বিশ্বসংসারে রৌদ্র, বৃষ্টি ; ঝড়, ঝঞ্ঝা ; সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া কালে কালে মানব-মাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিতেছে যাঁহারা সে সুমহৎ সৃষ্টি ব্যাপ্যার হইতে সুদূরে পলাইয়া নিভৃতে বসিয়া আপনার মনে কোন একটা ভাবরস সম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্ম্মের চরম সাধনা, প্রেমের সাধনা, বলিয়া মনে করেন, এই বিকাশমান মানবের সভ্যতা, অন্তর বাহিরের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করিয়া আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করিবার জন্য মানবের চিরদিনের চেষ্টা এই পরম দুঃখের ও পরম সুখের সাধনা, যাঁহারা এ সকলকে মিথ্যা বলেন, কত বড় মিথ্যা তাঁহাদের চিত্তকে আক্রমণ করিয়াছে! এত বড় বৃহৎ সংসারকে যাঁহারা ফাঁকি বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা কি সত্যস্বরূপ ভগবানকে সত্যই বিশ্বাস করেন? উপনিষদ্ বলিয়াছেন "আত্মক্রীড়ঃ আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষাং ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ"—পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে অথচ আনন্দের

শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বসংসারে এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মা শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেই আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়। কারণ মানব সমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব কেবল জানা মাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে; মানবের বিচিত্র প্রীতি সম্বন্ধের মধ্যে ভগবানের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব ও আস্বাদন করিতে পারা আমাদের চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম দ্বারা মানবের সেবারূপে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া আমাদের কর্ম্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণ হয়। এই জন্যই ভগবানের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও ধর্ম্ম দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই। মাতা যেমন শিশুর পক্ষে একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই সর্ব্বাপেক্ষা নিকট; সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য সম্বন্ধ, শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য্য, তেমনি শ্রীভগবান মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান। এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম্মকরি। এই জন্য মানব-সংসারের মধ্যেই ভগবানের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা; অন্য উপাসনা আংশিক; কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা, সে উপাসনা দ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাকে লাভ করিতে পারি না। আজ পৃথিবীতে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যেই এই শিক্ষা, এই দীক্ষা, পূর্ণতম ভাবে আছে। কিন্তু আজ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাহা হইতে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছি। আজ যদি প্রীতির সম্বন্ধে আমরা আবদ্ধ হইতাম তাহা হইলে এই প্রধান নবদ্বীপে, ইহা আমার কল্পনা নয়, অতি রঞ্জিত নয় প্রবাসী সহায়হীন রুগ্নের মুখে কেহ জল দিতে চায় না। পথের ধারে বিসূচিকা রোগী কাতরকণ্ঠে যখন জল জল করিয়া চীৎকার করিতেছে, তখন আমরা সানন্দে কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া তাহারি পার্শ্ব দিয়া নাচিতে নাচিতে যাইতেছি। প্রবাসী নিঃসহায় রুগ্নকে আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না।

এই শ্রীধাম নবদ্বীপে যে এরূপ ঘটনা প্রতিদিন হইয়া থাকে তাহা আজ আমি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে প্রস্তুত। যে ধর্ম্মের ভিত্তি "জীবে দয়া নামে রুচি—বৈষ্ণব সেবন" যাঁহার মহাবাক্য "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান" যে ধর্ম্মে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গকে অপবর্গ বলিয়া মানবের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই মানব জীবনের প্রয়োজন বলিয়া প্রচার করিয়া জগতে এক অভিনব সত্য প্রচার করিয়াছে। আজি সেই ধর্ম্ম যাজন করিয়া আমরা শ্রীভগবানের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কেবল ভাবরসে ও কল্পনায়—জীবে দয়া কেবল নিরামিষ ভোজনে বৈষ্ণব-সেবন কেবল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগের মত ও স্বার্থ রক্ষণে পরিণত করিয়াছি। আজ সমস্ত ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট আমাদের আবেদন এই যে আসুন আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সকলে মিলিয়া বৃথা দ্বেষ হিংসা ভুলিয়া ধর্ম্মকে কেবল আচারগত অনুষ্ঠানগত না করিয়া ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর ধর্ম্মের মহাবাক্য "জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব কেবল, জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান" প্রভৃতি মহাবাক্যগুলি কেবল কথায় নয়, বক্তৃতায় নয়, সঙ্গীতে নয়; মনে প্রাণে জীবনে প্রতিদিনের কর্ম্মে যাজন করি।

আমার বলিবার আর কিছুই নাই, তবে যে মহাত্মার একমাত্র একান্ত চেষ্টায় ও ব্যয়ে আজ ৫ বৎসরাবধি এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী হইতেছে, শ্রীমান মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আমার কায় মনোবাক্যে আজ সেই বঙ্গকুলতিলক মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের মঙ্গল প্রার্থনা করি। আর সর্ব্বশেষের একটি কথা এই যে, আজ এক এক করিয়া মহারাজের ব্যয়ে বৈষ্ণব সম্মিলনী ৫ বৎসর হইল। আমরাও অনেকে অনেক ভাবে, অনেক রূপে সম্মিলনীতে যোগ দানও করিলাম। কিন্তু আমাদের নিজেদের দিক্‌টার কি দেখিবার ও ভাবিবার আর কিছুই নাই? কেবল বৎসরান্তে এক একবার কেহ মহারাজের ব্যয়ে, কেহ বা নিজ ব্যয়ে সম্মিলনীতে যোগ দিয়া, দুই পাঁচটা আবেদন, নিবেদন, সমর্থন ও অভিভাষণ শুনিয়া আমাদের কর্ত্তব্যের শেষ ও চরম করিব? মহারাজ অনেক অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম করিতেছেন, আমরা কি করিয়াছি? গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর জন্য প্রকৃত পক্ষে কতটুকু ত্যাগ করিয়াছি তাহা ভাবিবার কথা। তাহা যদি আমরা না করিয়া থাকি, না করিতে চেষ্টা করি ও না করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি শ্রীভগবানের অভিসম্পাত পতিত হইবে।*

নিত্যানন্দ দাস।

* গত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে সময়াভাবে সাধু নিত্যানন্দ দাস এই প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর আমরা তাহা প্রকাশ করিতেছি।

কর্ম্মত্যাগ

"ঝি! ওঝি! ঝি! শুনতে পাচ্ছ না?"

"যাই গো বাবু, পান কটা সেজে রেখে যাই।"

"আগে শু'নে যাও।"

আজ "রথযাত্রা" উপলক্ষে অনেকে হাফ্ ডে (Half day) অফিস করিয়া বাসায় আসিয়াছে। তাই সকাল সকাল ঝির খোঁজ পড়িয়াছে। পান সাজা অসমাপ্ত রাখিয়াই ঝি উপরে আসিয়া বলিল "কিগো বাবু এত ডাকাডাকি করছ কেন?"

"খাবার আনতে হবে না?"

"তার জন্যে এত ডাকাডাকি, আমি ভাবলাম বুঝি রথের পার্ব্বনি দেবে।"

"রথের পার্ব্বনি?" সে আবার কি?" যত বাজে কথা।"

"ও সব শুনছি না, পার্ব্বনি না পেলে খাবার আসবে না।"

"আচ্ছা যাও খাবার নিয়ে এস। খেয়ে শরীর ধাতস্থ হো'ক তারপর দেখা যাবে।"

"পার্ব্বনি আমার কিন্তু চাই" বলিয়া ঝি, খাবার আনিতে চলিয়া গেল।

চার বৎসরের মেয়েটী কোলে লইয়া ঝির মা বিধবা হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাহাকে বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। গ্রামে কাহারও বাড়ী কোন কর্ম্ম হইত না কারণ তাহাদের "জল চলিত" না। নিরুপায় বিধবা প্রতিবেশী হৃষীকেশ দাদার পরামর্শে তাহার সহিত সহরে কাজ করিতে আসে, কারণ "জল চলা না চলা" লইয়া সহরে বিশেষ আটকায় না। হৃষীকেশ ছাপাখানায় কাজ করিত ও একটী খোলার বাড়ীতে একটী ঘর ভাড়া লইয়া থাকিত; সেই বাড়ীতেই একটী ছোট ঘর ভাড়া করিয়া দিয়াছিল, বিধবা সেইখানেই থাকিত ও একটী মেসে কাজ করিত। কিছু দিন কাজ করিতে করিতে বিধবা বুঝিল হৃষীকেশের এই সহৃদয়তা একান্ত নিস্বার্থ নয়। তাহার ভিতরের পঙ্কিলতা যখন ধীরে ধীরে প্রকাশ হইতে লাগিল তখন বিধবা ত্রস্ত হইয়া অন্যত্র উঠিয়া গেল। চতুর্দ্দিকের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য অভাগিনী একস্থান হইতে অন্যস্থান করিতে করিতে একটী সহৃদয়া বর্ষীয়সী বিধবার আশ্রয় পাইল। বর্ষীয়সীর আর কেহ ছিল না তিনি হতভাগিনীর

দুঃখের কথা শুনিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়া তাহার মেয়েটীকে লেখা পড়া শিখাইতে লাগিলেন।

মেয়েটী বড় হইলে যখন তাহার বিবাহের চেষ্টা হইতেছিল সেই সময়ে তাহার আশ্রয়দাত্রী ইহসংসার ত্যাগ করিলেন। বিধবাকে আবার উদরান্নের জন্ম বাহির হইতে হইল। এবারে মেয়েটির চিন্তায় তাকে পীড়িত করিতে লাগিল। কন্যার বিবাহ দিতে অর্থের প্রয়োজন কিন্তু তাহার কিছুই নাই। অনেক চেষ্টায় কোন দরিদ্র ভদ্র পরিবারে একটী খোলার ঘর লইল। মেয়েটী তাহাদের কাজ করিত নিজে বাহিরে কাজ করিয়া আসিয়া তাহাকে সাহায্য করিত। মেস হইতে যে খাবার লইয়া আসিত তাহাতেই দুজনারই চলিত। রাত্রে "মায়ে ঝিয়ে" যখন একত্র শয়ন করিত তখন কন্যাকে আপন জীবনের সমস্ত দুঃখ কাহিনী ও তাহার চিরস্মরণীয়া আশ্রয়দাত্রীর নিকট যাহা কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছিল সেই সমস্ত বিবৃত করাই তাহার প্রধান কাজ ছিল। কন্যার বিবাহ চিন্তা যদিও তাহার সমস্ত জীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল তথাপি কন্যার বিবাহ না দিয়াই তাহাকে ইহলীলা সংবরণ করিতে হইল।

মাতার মৃত্যুর পর কন্যাকেও উদরান্নের চেষ্টায় বাহির হইতে হইল; কিন্তু তাহার যৌবনই তাহার কর্ম্মের প্রধান অন্তরায় হইল। প্রায় সকল স্থান হইতেই তাহাকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল যদি কর্ম্ম জুটিল ত স্থির হইয়া কাজ করিবার সুবিধা হইল না। গৃহস্থ বাড়ীর আশা ছাড়িয়া মেসে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অনেক মেস্ ঘুরিয়া এই মেসে প্রায় দুই বৎসর কাজ করিতেছে। এখানে লোক কম সুতরাং বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না; এবং মেসের বাবুরা অনেক ভাল। এই দুই বৎসরের মধ্যে সে কোন বাবুর এমন কোন ব্যবহার লক্ষ করে নাই যাহার জন্য তাহাকে কুণ্ঠিতা হইতে হয় যথা সময়ে ঝি সকলের নিকট হইতে পার্ব্বনি পাইল। নরেন বলিল "ঝি নূতন বাবু কি দিলে?"

"নূতন বাবুর, দেখাই পাওয়া যায় না আজ এলেই ধরব।"

"তা হলে কেবল গাল খেতে হবে। ব্যাচারার বড় খাট্‌তে হয়। বেলা ন'টা আর রাত ন'টা।"

"খাবার সময় বাবুকে যখন চাবি দিতে ডাকব তখনই চাইব।"

নূতন বাবুর নাম বিজয় চন্দ্র ঘোষ, তিনি কোন সওদাগরি অফিসে কাজ করেন। অফিস হইতে আসিতে তাহার প্রত্যহ রাত্র হয়। সম্প্রতি মেসে

আসিয়াছেন বলিয়া তখনও "নূতন বাবু" আখ্যা আছে। একলা নীচের ছোট ঘরটীতে থাকেন বলিয়া তাহার কিছু বেশী ভাড়া দিতে হয় এবং শয়ন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যহ রাত্রে ভিতর হইতে দ্বারে চাবী বন্ধ করিতে হয়। ঝি যাইবার সময় বাহির হইতে "বাবু চাবী দিন" বলিয়া চলিয়া যায়। আজ ঝির সেই ডাকের অপেক্ষায় সে আপন নির্জ্জন ঘরে শয়ন করিয়া আছে এমন সময় ঝি আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল।

সাধারণ মেসের বাবুদের ঘর যেরূপ হয় এটী সেরূপ নয়। ঘরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। একখানা ছোট খাটে বেশ পরিষ্কার একটী বিছানা পার্শ্বে ই একখান ছোট টেবিল ও তদুপযুক্ত চেয়ার। কাল অয়েল ক্লথ মোড়া টেবিলের উপর একধারে খান কতক বই আর একধারে দোয়াৎ কলম চিঠির কাগজ খাম রহিয়াছে। ঘরে বিশেষ কোন ছবি নাই। কেবল একটী স্ত্রীলোকের একখান বড় ছবি আর খাটের কাছে একটা লাল কাগজে "ঈশ্বর মঙ্গলময়" লেখা ঝুলিতেছে। ঝিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিজয় বলিল "এ হতভাগ্যের ঘরে কি মনে করে পদার্পণ হয়েছে?" ঝি সে কথার কোন উত্তর না করিয়া বলিল "ঘর কি আপনি রোজ পরিষ্কার করেন?"

"কি করি তুমি ত কর না কাজেই নিজে করি।"

"সকলের ঘরই ত পরিষ্কার করি। আপনার ঘর বন্ধ থাকে নইলে কি করতে পারি না?"

"সে কথা এখন যাক্ কি মনে করে এসেছ বল শুনি।

"কেন আস্তে কি নেই?"

"আসতে থাকবে না কেন জন্ম জন্ম এস, তবু একটা কিছু মনে করে ত এসেছ।"

"রথের পার্ব্বনি দেবেন না?"

"আসল কথা বল! আর আর বাবুরা কি দিলে?"

"আপনি যা দেবেন দিন আর বাবুরা কিছু দেন নি। এঃ বৃষ্টি এল যে, আজ "রথ" কি না!"

বিজয় পকেট হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া ঝির হা'তে দিয়া বলিল যে বৃষ্টি হচ্ছে এখন ত যেতে পারবে না। একটু বসে যাও বৃষ্টি একটু ধরুক। রাত্রি এখনও এগারটা বাজে নি।"

রাত্রি যদিও বেশী হয়নি তথাপি নির্জ্জন গলিটী নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টির শব্দ, মনে একটা নিস্তব্ধ একাগ্রতার সঞ্চার করিয়া দিতেছিল। পার্শ্ববর্ত্তী বড় রাস্তা দিয়া সেই বৃষ্টিতেও এক একখান ভাড়াটীয়া গাড়ী ছড়্ ছড়্ শব্দে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া যাইতেছিল। আষাঢ়ের এই বর্ষণ কাতর রাত্রে প্রিয় বিরহ ব্যাকুল কোন অনিদ্র যুবক পার্শ্ববর্ত্তী মেস হইতে গাহিয়া উঠিল "কেমনে কাটাব সারা রাতিয়ে।" বিজয় টেবিল হইতে মেঘদূত খান লইয়া খুলিল এমন সময় ঝি জিজ্ঞাসা করিল "নূতন বাবু! আপনার বাড়ীতে কে আছে গা"?

"আমার কেউ নেই ঝি!"

"কেউ নেই?"

"ভালবাসবার মত আপনার লোক কেউ নাই।"

"আপনি কি "বে" করেন নি!"

"সব মরে গেছে" বলিয়া বিজয় গবাক্ষের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

২২ বৎসর বয়সের সময় বিজয়ের পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। সংসারে এক বালিকা স্ত্রী ভিন্ন অন্য কেহই ছিল না। কলেজ ছাড়িয়া পিতার যা কিছু বিষয় ছিল তাহারই তত্ত্বাবধান করিতে গিয়া দেখিল মাঝে মাঝে মফঃস্বলে না যাইতে পারিলে সুবিধা হয় না। বালিকা স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দূর সম্পর্কের এক দরিদ্রা ভগ্নি ও তাহার এক বিধবা কন্যাকে সংসারে লইয়া আসে। দুই বৎসর পরে যখন তাহার স্ত্রী একটী মৃত পুত্র প্রসব করিয়া ইহসংসর ত্যাগ করিল তখন প্রতিবেশীদের নিকট হইতে শুনিতে পাইল যে তাঁহার ভগ্নি ও ভগ্নি কন্যার অযত্ন ও অসদ্ব্যবহারই তাহার স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ। আত্মীয়ের অকৃতজ্ঞতায় ব্যথিত হইয়া সেই যে কলিকাতায় আসিয়াছিল আজ চারি বৎসর আর গৃহে ফিরে নাই। পুরাতন গমস্তার উপর সেই হইতে বিষয়ের ভার দিয়া কলিকাতায় কর্ম্মের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। কর্ম্মের মধ্যেই আপন হৃদয় বেদনা ভুলিয়া থাকিতে চায়। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার স্বর্গীয়া পত্নীর উপর যে অযথা অত্যাচার হইয়াছিল, নিজেকে সংসারের সুখ হইতে ছিন্ন করিয়া লইয়া সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায়।

আজ অফিস হইতে ফিরিবার সময় সে চারিদিকেই একটা আনন্দ উৎসব প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলি ভাল কাপড় ও পোষাক পরিধান করিয়া "রথ" দেখিতে যাইতেছে। কেহ বাঁশী কিনিয়া আনন্দে বাজাইতেছে। কেহ পুতুল কিনিয়া তাহাকে সযত্নে পুত্রের ন্যায় কোলে লইয়া চলিয়াছে। এই সব দৃশ্য কেবলই তাহাকে একটী আত্মীয়স্বজন পরি-

বেষ্টিত সুখময় সংসারের প্রলোভন দেখাইতেছিল এবং তাহাকে বারবার স্মরণ করাইয়া দিতেছিল যে এ সংসারে তাহাকে ভাল বাসিবার কেহই নাই। আজ সে যখন ঝির প্রশ্নের উত্তর দিল "আমাকে ভালবাসিবার কেহই নাই" তখন তাহার এই কথা কয়টি তাহার হৃদয়ের সমস্ত নিগূঢ় বেদনা প্রকাশ করিয়াছিল।

প্রসঙ্গান্তরে যাইবার জন্য ঝি বলিল "বাবু আপনি কটা পর্য্যন্ত জেগে থাকেন ?"

"রাত্রি এগারটা বারটা যতক্ষণ না ঘুম আসে।"

"এত রাত্র পর্য্যন্ত কি করেন" ?

"পড়ি ! চুপ করে বসে থাকি।"

"বৃষ্টি একটু কমেছে বোধ হচ্ছে, আমি যাই। আপনি চাবিটা দিন।

(২)

বাটি যাইতে যাইতে ঝির কেবলই মনে হইতে লাগিল যে নূতন বাবু বলিয়াছে তাহাকে ভালবাসিবার কেহই নাই। বাটি যাইয়া কাপড় ছাড়িয়া সে তাহার আপন নির্জ্জন ঘরের ছিন্ন শয্যায় শয়ন করিয়া সেই কথাই ভাবিতে লাগিল। নূতন বাবু বলিয়াছে "আমাকে ভালবাসিবার কেহ নাই" কিন্তু তাই কি ? জগতে কত লোক আছে যাহাদের ভালবাসিবার কেহ নাই তাহাকেও ত ভালবাসিবার কেহ নাই। কিন্তু এই কথা কয়টি সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। নববিবাহিত ছাত্রের মনে বালিকা বধুর মধুর স্মৃতির ন্যায় এই কথাটা তাহাকে বারবার পীড়িত করিতে লাগিল। এ কথাটি ত কেবল মুখের কথা নয়। সমস্ত কাজ কর্ম্মের অন্তরালে তাহার যে অবরুদ্ধ কোমল নারী প্রকৃতি ছিল এই কথা কয়টী একটী করুণ প্রার্থনা লইয়া তাহার রুদ্ধদ্বারে বারবার আঘাত করিতে লাগিল ; নূতন বাবুর জন্য একটি সুমধুর সমবেদনায় তাহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল।

পরদিন সকালে প্রথমেই ঝি বিজয়ের ঘর পরিষ্কার করিল। নরেন জিজ্ঞাসা করিল "ঝি যে আজ প্রথমেই নূতন বাবুর ঘরে ! কত পার্ব্বনি পেলে ?" ঝি সগর্ব্বে উত্তর করিল "এক টাকা"। সেইদিন হইতে যাইবার সময় ঝি কেবল মাত্র বাহির হইতে ডাকিয়া দিয়া চলিয়া যাইত না। ঘরে প্রবেশ করিয়া দুই চারিটা কথা কহিয়া, দুই চারিটা কাজ করিয়া তবে যাইত। আবার যদি বৃষ্টি আসিত তাহা হইলে বসিয়া বসিয়া গল্প করিত, কোন বই পড়িতে বলিয়া একাগ্রমনে শুনিত। এক একদিন বৃষ্টি আসিল বলিয়া পড়া আরম্ভ হইত কিন্তু কখন

যে বৃষ্টী থামিয়া গিয়া মেঘ কাটিয়া যাইত তাহা সে টের পাইত না। হঠাৎ বিজয় যখন বলিয়া উঠিত "বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে" তখন সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইত। আপনার সমস্ত কাজ কর্ম্মের মধ্যে সে বাহির দিকে প্রায়ই চাহিয়া দেখিত এবং বিজয় আসিলেই সে তাড়াতাড়ি এক গ্লাস জল ও পান দিয়া আসিত।

বিজয় ত ঝিকে বিশেষ অনুগ্রহ করিত, প্রায়ই এক একখানা পুরাতন কাপড় ও বকশিশ্ দিত, এবং অফিস্ হইতে দুইখানা রঙ্গিল কাপড়ও আনিয়া দিয়াছিল। তাহার এই অনুগ্রহের জন্যই যে ঝি তাহাকে বিশেষ যত্ন করিত সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহই ছিল না। এজন্য তাহাকে অনেকে অনেক তামাসাও করিত এবং সেও তাহা হাস্য মুখে গ্রহণ করিত।

প্রত্যেক বুধবারে অফিস হইতে আসিতে বিজয়ের অনেক রাত্র হইত সেজন্য তাহার রুটি খাবার ঘরে ঢাকা দিয়া রাখিয়া সকলে চলিয়া যাইত। এক বৃহস্পতিবারে সকালে আসিয়া ঝি দেখিল যে রুটি ঢাকা পড়িয়া আছে তাড়াতাড়ি বিজয়ের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাল রাত্রে যে আপনি খাওনি কোন অসুখ করেছে নাকি ?"

"কাল রাতে আসতে অনেক দেরী হয়ে গেল আর রান্নাঘরে গিয়ে খেতে ইচ্ছা ক'রল না। তুমি ত একটু বসতে পার না ?" শেষের কথাটা বিজয় নিতান্ত তামাসা করিয়া বলিয়াছিল কিন্তু তাহার পর হইতে প্রত্যেক বুধবারে বিজয়ের খাওয়া না হওয়া ঝি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিত।

আজ বুধবার সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়া রাস্তা ঘাট সমস্ত জলে ভাসিয়া গিয়াছে। এখনও সমান ভাবে বৃষ্টি হইতেছে। রাত্র এগারটা বাজিয়া গিয়াছে এখনও বিজয় অফিস হইতে আসে নাই। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ঝপ ঝপ শব্দ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। রান্নাঘরের বারান্দায় একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া ঝি বসিয়া আছে। বর্ষার এই বিদ্যুতময়ী অন্ধকার রজনীতে বসিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে তাহার হৃদয়ে একটা সুখের কল্পনা উদয় হইতেছিল। যদি সে তাহার আপনার ঘরে এমনি করিয়া একজনের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিত, সমস্তদিন পরিশ্রমের পর সে যখন ফিরিয়া আসিত তখন তাহাকে খাওয়াইয়া যদি তাহার শয্যাপ্রান্তে একটু স্থান অধিকার করিতে পারিত, তাহা হইলে জীবন কত সুখের হইত! কিন্তু হায়! তাহা হইবার নয়। নারী জীবনের চরম স্বার্থকতা হইতে সে বঞ্চিত [illegible]।

একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিয়া গেল। এমন সময়ে বিজয় আসিয়া প্রবেশ করিল ঝি তাড়াতাড়ি আলো লইয়া গেল বৃষ্টিতে ভিজা কাপড় ছাড়িয়া "আমার জ্বর হয়েছে কিছু খাব না" বলিয়া বিজয় শুইয়া পড়িল ছয় দিবস পরে বিজয় যখন একটু সুস্থ হইল তখন ঝির বাসায় ফিরিবার অবকাশ হইল। ছয় দিবস রাত্র জাগরণ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অবসন্ন দেহে বাসায় ফিরিয়া যে অভ্যর্থনা পাইল তাহা কোন ক্রমেই সুখকর বলা যাইতে পারে না। গিন্নি বলিলেন "ওমা কেমন মেয়ে গো! আমরা ত ভেবে বাঁচিনি! ছদিন কোন খবর নেই। সোমত্ত মেয়ের এ কেমন ব্যাপার বাপু! কর্ত্তা বলিলেন "আমরা বাছা গেরস্ত, তোমার মা ভাল লোক ছিলেন তাই আমাদের বাড়ীতে থাকতে দিয়াছিলুম, তোমার এখানে সুবিধা হবে না। তুমি অন্য বাসা দেখ। আসছে মাস হতে আমাদের এখানে তোমার থাকা হবে না স্পষ্ট বলে দিলুম!" নিজেকে ইহাঁদের কাছে নির্দ্দোষী প্রমান করিতে তাহার ইচ্ছাই হইল না কেবল যত শীঘ্র সম্ভব যে অন্যত্র যাইবে ইহাই জানাইয়া দিল।

মেসের বাবুরা বাবুরা বলিলেন "দেখুন বিজয়বাবু ঝি কিন্তু আপনার খুব সেবা করেছে। আপনার লোকেও অত করতে পারে কিনা সন্দেহ।"

বিজয় উত্তর করিল "যেখানে কিছু পায় সেইখানেই করে আপনি দিলে আপনাকেও করবে।"

কথাটা শুনিয়া ঝির মনে বড় ব্যথা লাগিল। সে কি কিছু পায় বলিয়াই যত্ন করে। কিছু পাইয়া যে যত্ন ও তাহার যত্নের মধ্যে কি কোন প্রভেদ নাই? সেই কি তাহাকে একটু ভালবাসিতে বলে নাই? অমন ভাবে "আমাকে ভাল বাসিবার কেহ নাই" একথা বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? ঝি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল আর একটুও যত্ন করিবে না আর তাহার নিকট হইতে কিছু লইবেও না। কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন মনে হইল বিজয়ের দুধ খাওয়া হয় নাই এবং সে হয়ত তাহারই দুধ লইয়া যাইবার অপেক্ষায় আছে তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। মনে মনে স্থির করিল এখন দুধটা দিয়া আসিবে কিন্তু রাত্রে যাইবার সময় বাহির হইতে ডাকিয়া দিয়াই চলিয়া যাইবে। রাত্রে যাইবার সময় দ্বারের নিকট আসিয়া ভাবিল একবার মাত্র "কেমন আছ" জিজ্ঞাসা করিয়াই চলিয়া যাইবে। ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিল বিজয় ঘুমাইতেছে, জানালা খোলা রহিয়াছে। নিঃশব্দে জানালার দ্বার বন্ধ করিয়া উপর হইতে [illegible] ডাকিয়া দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

(৩)

বুধবারের দিন বেলা এগারটার মধ্যে বিজয়কে বিমর্ষভাবে বাসায় ফিরিতে দেখিয়া ঝি উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল এত সকাল করে এলে যে, আবার অসুখ ক'রল নাকি ?

বিজয় সংক্ষেপে উত্তর করিল "না।"

"এত সকাল ক'রে এলেন কেন ?"

"চাকরি ছেড়ে দিয়েছি"। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে বাহির হইয়া ঝিকে বলিল "ঝি আমি আজই বিকালের ট্রেণে পশ্চিমে বেড়াতে যাব আমার ট্রাঙ্কটা একটু গুছিয়ে দাও ত।"

"আবার কবে আসবে" ?

"আর আসব না।"

ঝি কথাটার ঠিক মানে বুঝিতে না পারিয়া বিজয়ের মুখের প্রতি চাহিল, সে বলিল "এখানে ত চাকরি গেল আর আমার শরীরও খারাপ, পশ্চিমে গিয়া সেইখানেই একটা চাকরি জোগাড় করিয়া লইব, এখানে আর আসিব না।" ঝি কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে ট্রাঙ্ক বোঝাই করিতে লাগিল।

একটী সামান্য কারণে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া বিজয়ের মনটা বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল। সে আস্তে আস্তে বাসায় আসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে ত অভাবের জন্য চাকরি করে না নিজেকে সে কোন রকমে ব্যস্ত করিতে চায়। বেশ, সে ত দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারে ? এত দিন সে যে তাহা না করিয়া এই জঘন্য দাসত্ব করিতেছিল কেন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। ঘরে ঝুলান "ঈশ্বর মঙ্গলময়" লেখাটার প্রতি চাহিয়া বলিল "এই যে আঘাতের মধ্যেও মঙ্গলের বীজ নিহিত ছিল, তাহাই আজ আমাকে মুক্ত করিয়া দিল, আমি আজই পশ্চিমে যাইব। সংকল্প স্থির হইয়া গেল।

বিদায়ের সময় আসিল। আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় বাসার সকলেই আজ ব্যথিত। মাত্র তিনটি মাস বিজয় তাহাদের সহিত আছে তথাপি তাহাকে ছাড়িয়া দিতে সকলেরই ব্যথা বাজিতে লাগিল। ঠাকুর গাড়ী ডাকিয়া আনিল। মেসের সমস্ত হিসাব মিটাইয়া দিয়া ঠাকুরকে বক্শিশ্ দিয়া, বিজয় ঝির উদ্দেশ্যে চারিদিকে চাহিল। রান্নাঘরের বারান্দায় ঝি নিবিষ্ট মনে পান সাজায় ব্যস্ত ছিল, যেন কোনদিকেই তাহার মন নাই। বাহিরের এই ব্যাপারটা যেন তাহার নিকট অতি তুচ্ছ, ইহার জন্য যেন তাহার দৈনন্দিন কাজের কোন ব্যতিক্রমই

ঘটিতে পারে না—এমন ভাবে কাজ করিতেছিল। "ঝি যাবার সময় বেশী করে গোটাকতক পান দাও" বলিয়া বিজয় আপনার ঘরে চলিয়া গেল। এক গ্লাস জল ও পান টেবিলের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে ঝি চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বিজয় তাহাকে ডাকিয়া বলিল "ঝি, সময়ে অসময়ে তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তা' আমি ত চল্লুম, এই পাঁচটা টাকা নাও তোমার যা ইচ্ছা কিনো।"

"না না ও সব আমায় কিছু দিতে হবে না, আমার কিছু চাই না।"

সে যে এত যত্ন করিয়াছে তাহারই মূল্য স্বরূপ বিজয় যে আজ তাহাকে পাঁচটা টাকা দিবে, এ কথা তাহাকে আঘাত করিল। বিজয় চলিয়া যাওয়ায় তাহার যে কোন কষ্ট হইবে না বা হইতেছে না, এই কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য সে এতক্ষণ তাহার হৃদয়ের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল। কিন্তু এবার সে আর নিজের দারুণ অভিমান কিছুতেই সামলাইতে পারিল না। সে সবলে বলিয়া উঠিল "না না আমায় কিছু দিতে হবে না—আমার কিছু চাই না" এবং তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল।

বিজয়ের মনে একটা অস্পষ্ট সন্দেহের ছায়া পড়িল, যে কথা সে একবার ভুলিয়াও ভাবে নাই সেই কথাটাই চকিতের মত তাহার মনে উদয় হইল সে একবার অস্ফুটস্বরে ডাকিল "ঝি!" বাহির হইতে গাড়োয়ান ডাকিল "কই গো বাবু আসুন গাড়ীর সময় হয়ে গেল।"

(৪)

আজ তিনদিন বিজয় চলিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে, কেবল একটী লোকের কাছে, কেবল একখানি ব্যথিত হৃদয়ের কাছে এই ঘটনাটি সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্মের অপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিয়াছে। একটি হৃদয়ের কাছে এই তিনটি বর্ষাম্লান শ্রাবণ প্রভাত একটি প্রকাণ্ড প্রাণহীন অবসাদ বহন করিয়া আনিয়াছে। কিছুই ভাল লাগে না। কাল তাহাকে বাসা ছাড়িয়া যাইতে হইবে কিন্তু নূতন বাসা সন্ধানের মত উৎসাহ তাহার ছিল না।

প্রথম যে দিন বিজয় চলিয়া গেল সেই রাত্রে বাসায় ফিরিবার সময় তাহার শূন্য ঘরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার হৃদয়ের মধ্যেও ঐরূপই একটা শূন্যতা অনুভব করিল। অবিরল অশ্রু ধারায় উপাধান সিক্ত করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল "একি হইল! তাহারই কার্য্য কালের মধ্যে ত কত বাবু আসিয়াছে, কত বাবু গিয়াছে কিন্তু কাহারও জন্য ত এমন হয় নাই। এবারে তবে মন এমন হইল কেন? সে তাহার কে? সে তাহার কি করিয়াছে সেই যে

একদিন বর্ষণ-কাতর অন্ধকার রজনীতে একটি করুণ প্রার্থনা তাহার করুণ নারী-হৃদয়ের রুদ্ধ কক্ষে বারবার আঘাত করিয়াছিল সে কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। তাহার পরের কতদিনের কত মধুর স্মৃতি তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। সে সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত। সকল বাবুরা যখন আফিস হইতে ফিরিত তখনই তাহার মনে হইত আর একজন আসিবে না। রাত্রে যাইবার সময় উপর হইতে বাবুদের সদর বন্ধ করিতে ডাকিবার সময় তাহার কথা মনে হইত আর একজন যে প্রত্যহ বন্ধ করিত সে নাই। এইরূপে অনবরত স্মৃতির একটা অসহ্য উৎপীড়ন সহ্য করিতে করিতে তাহার প্রায়ই মনে হইত সহস্র স্মৃতি-বিজড়িত এই স্থান ত্যাগ করাই শ্রেয়। কিন্তু হায় তাহারও সাহস হইত না, শীঘ্র তাহাকে এক নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইবে এমন সময়ে এই মেসের কার্য্য সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। নূতন যেখানে বাসা করিবে সে স্থান যে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই! মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল একটি সম্পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান করিয়া এই মেসের কর্ম্মত্যাগ করিবে।

আজ ফিরিবার সময় বৃষ্টি আসিয়াছে। উপর হইতে বাবু ডাকিয়া বলিলেন "ঝি একটু বস বৃষ্টি থামিলে চাবী দিব।" বসিয়া বসিয়া ঝির মনে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আরও কত দিন এমন বৃষ্টি আসিয়াছে তখন সে ঐ সম্মুখবর্ত্তী ক্ষুদ্র ঘরটীতে সুখে সময় কাটাইয়াছে। ঐ ত সেই ঘর রহিয়াছে! ওখানে যাইয়া আর কিন্তু সে তৃপ্তি নাই। তবু সে আলোটা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল সেই খাট পড়িয়া রহিয়াছে, সেই টেবিল, সেই চেয়ার, সেই সব কেবল একটী লোক নাই। একটা প্রকাণ্ড অভিমানে তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল কিন্তু তখনই মনে হইল যাহার উপর অভিমান, সে নাই। একেরই অভাবে সমস্ত ঘরটা যেন প্রাণহীন। এই অচেতন চেয়ার টেবিলগুলা হইতে পর্য্যন্ত একটা নীরব অব্যক্ত ক্রন্দন তাহার চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইতে লাগিল। একটা দমকা বাতাস আসিয়া তাহার হৃদয়ের সহিত বাহিরের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই বোধ হয় আলোটা নিবাইয়া দিয়া গেল। এই নির্জ্জন অন্ধকার ঘরে দাঁড়াইয়া সহস্র সুখ-স্মৃতি তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। একটা অপ্রকাশ্য নিগূঢ় বেদনা তাহার হৃদ্‌পিণ্ডটাকে সবলে চাপিয়া ধরিল। হায়, সে কেন গেল! তাহার হৃদয়ের সমস্ত কুসুমগুলি ফুটাইয়া সে কেন এমন নির্দ্দয় ভাবে চলিয়া গেল! "ওগো, ফিরে এস গো ফিরে এস," বলিয়া সে লুটাইয়া পড়িল। বিদ্যুৎ

হাসিয়া বলিয়া গেল, সে আসিবে না। বৃষ্টির ঝর ঝর শব্দ আপন অস্পষ্ট ভাষায় বলিতে লাগিল—"আসিবে না, আসিবে না," ঝি লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

উপর হইতে ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া ঝি চলিয়া গিয়াছে মনে করিয়া নরেন দ্বার বন্ধ করিতে নীচে আসিল। তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া "কাল হ'তে আমি আর আসব না" অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে এই কথা বলিয়া ঝি ঝড়ের মত বেগে বাহির হইয়া গেল। তাহার গায়ে লাগিয়া নরেনের বাতি যে পড়িয়া নিবিয়া গেল এবং দুয়ারে বাধিয়া যে তাহার কাপড়খানা ছিঁড়িয়া গেল তাহা সে লক্ষ্যই করিল না।

শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়।
রাণাঘাট।

চিন্তা

নির্জ্জন প্রান্তরে
বসে বসে একা,
যদি, করিতাম খেলা
নদীতটে;
নদী বেলা চয়
দেখিতাম সেথা
আঁকিতাম তাহা
হৃদিপটে।
সুন্দর প্রভাতে
উঠিতাম সুখে
রাঙ্গা মেঘ পানে
চাহিয়ে;
করিতাম গান
তৃণ-শয্যা-পরে
আপনা আপনি
মাতিয়ে।
মম খেলা সাথী
যদি, হ'ত পশু পাখী

নির্জ্জন নীরব
কান্তারে;
তেঁই সনে আমি
নাচিয়ে নাচিয়ে
বেড়াতাম তথা
বিভোরে।
দুখ মোহ শোক
নাহি বয় কভু,
সদা পুণ্য সেথা
রাজিছে।
নাহি সেথা অমা,
সদাই পূর্ণিমা,
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু
গাহিছে;
আমি, তা'র মাঝ খানে
বসিয়া বিজনে
কাটা'তাম সদা
ধেয়ানে।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মল্লিক।

শ্রীশ্রীকুন্তীদেবীর স্তব (৯)



ভারাবতরণায়ান্যে ভুবো নাব ইবোদধৌ।
সীদন্ত্যা ভূরিভারেণ জাতোহ্যাত্মভুবার্থিতঃ ॥

তোমার এ বিশ্বে আবির্ভাবের কারণ।
অন্য লোকে অন্যরূপ করয়ে বর্ণন ॥
মহাসাগরেতে যথা, তরণী বিপদ-যুতা,
সেইরূপ এ পৃথিবী, সুভীষণ ভার,
সহিতে না পারি গেলা নিকটে ব্রহ্মার ॥
নিবেদিলা চতুর্ম্মুখ তোমার চরণে,
আবির্ভাব তাই তব ভূভার হরণে ॥

ভবেঽস্মিন্ ক্লিশ্যমানানামবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যন্নিতি কেচন ॥

কেন তুমি আসিয়াছ, তাহার উত্তরে,
এইরূপ নানামত আছয়ে সংসারে।
আমার মনেতে হয়, এ সকল কিছু নয়,
নররূপে তব আবির্ভাবের কারণ,
আমি এইরূপ হেতু করি নির্দ্ধারণ ॥
পরম আনন্দময়, জীবের স্বরূপ হয়,
অবিদ্যার দ্বারা তাহা সমাবৃত হয়,
দেহাদিতে অভিমান করয়ে উদয়।
এই অভিমান হৈতে, কাম জন্মে অচিরাতে,
কাম হৈতে নানা কর্ম্ম করিয়া সাধন,
জীবের জনমে ক্লেশ, সংসার বন্ধন।
এই ক্লেশ নিবারণ, করিবারে নারায়ণ,
নানারূপ লীলা কর আবির্ভূত হ'য়ে
ফলে, সংসারীর প্রেম ভক্তি উপজয়ে।
শ্রবণ স্মরণ আর অর্চ্চন করিয়া,
তব লীলা, যায় লোক সংসার তরিয়া।

শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্ত্যভীক্ষ্ণশঃ
স্মরন্তি নন্দন্তি তবেহিতং জনাঃ।
ত এব পশ্যন্ত্যচিরেণ তাবকং
ভব-প্রবাহোপরমং পদাম্বুজং॥
তোমার চরিত্র কথা ওহে কৃপাবান!
যাহারা শ্রবণ করে কিম্বা করে গান।
সদা উচ্চারণ করে, কিম্বা মনে মনে স্মরে,
কিম্বা অপরের মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া
আনন্দে পূর্ণিত হয় যাহাদের হিয়া।
তব পাদপদ্মদ্বয়, অচিরে দর্শন হয়,
ফলে জন্ম-পরম্পরা মধ্যে পর্য্যটন
চির তরে তাহাদের হয় নিবারণ॥
অপ্যদ্য নস্ত্বং স্বকৃতে হিত প্রভো
জিহাসসি স্বিৎ সুহৃদোঽনুজীবিনঃ।
যেষাং ন চান্যদ্ভবতঃ পদাম্বুজাৎ
পরায়ণং রাজসু যোজিতাংহসাং॥
আমাদের সুখ দুঃখ তব চরণেতে।
অদর্শনে দুঃখ, সুখ হয় দর্শনেতে॥
হে প্রভো, জগৎ গুরু, তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু,
আত্মীয়ের বাঞ্ছা পূর্ণ কর অনুক্ষণ,
আমাদের কেন আজি করিছ বর্জ্জন?
রাজগণে বহুক্লেশ, সমরেতে, হৃষীকেশ।
আমরা বিবিধরূপে, দিনু অনিবার,
তুমি ছাড়া আমাদের কেহ নাহি আর।
তুমি যাবে! তবে বুঝি গেল সুসময়,
দুঃসময় আসি ভাগ্যে হইল উদয়॥
কে বয়ং নামরূপাভ্যাং যদুভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ।
ভবতো দর্শনং যর্হি হৃষীকাণামিবেশিতুঃ॥
হে কৃষ্ণ, যাদবগণ বান্ধব আমার।

পাণ্ডবেরা পুত্র মোর জীবনের সার ॥
তাহারা জীবিত সবে, বীরত্বের সুগৌরবে,
কিন্তু যেই হবে হরি, তব অদর্শন,
খ্যাতি বা সমৃদ্ধি নাহি রবে কদাচন।
শরীরের নাম, রূপ, ওহে হরি, বিশ্বভূপ,
যেমন অতীব তুচ্ছ, জীব চলে গেলে,
তব কৃপা বিনা তথা আমরা সকলে।

নেয়ং শোভিষ্যতে তত্র যথেদানীং গদাধর।
ত্বৎ পদৈরঙ্কিতা ভাতি স্বলক্ষণবিলক্ষিতৈঃ ॥

গদাধর! আমাদের এই বাসভূমি!
কি শোভায় সুসজ্জিত করিয়াছ তুমি!
তোমার অসাধারণ, চরণের চিহ্নগণ,
বজ্রাঙ্কুশ আদি করি ইহাতে অঙ্কিত,
তুমি গেলে এই শোভা হবে অন্তর্হিত।

ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধা সুপক্কৌষধি বীরুধঃ।
বনাদ্রি নদ্যুদন্বন্তোহ্যেধন্তে তব বীক্ষিতাঃ ॥

তোমার দর্শনে এই জনপদ-চয়।
হয়েছে সমৃদ্ধিশালী ধান্যৌষধিময় ॥
সময়েতে লতাচয়, ফলযুক্ত পক্ক হয়,
বন গিরি সিন্ধু আর পর্ব্বত নিকর,
সকলেই হইয়াছে অতীব সুন্দর।
তুমি চ'লে গেলে হরি, এ সকল আর,
রহিবে না এই মত শোভার ভাণ্ডার ॥

অথ বিশ্বেশ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বমূর্ত্তে স্বকেষু মে।
স্নেহপাশমিমং ছিন্ধি দৃঢ়ং পাণ্ডুষু বৃষ্ণিষু ॥

হেথা হ'তে গেলে তুমি ওহে দয়াময়,
পাণ্ডবের অকুশল ঘটিবে নিশ্চয়।
না গেলে যাদবগণ, দুঃখ পাবে অগণন।
দুই দিক্ ভাবি আমি ব্যাকুল হৃদয়,

করিতে না পারি কিছু কর্ত্তব্য নিশ্চয়।
বিশ্বেশ্বর তুমি হরি, তব ইচ্ছা সর্ব্বোপরি,
সকলি করিতে তুমি সতত সক্ষম,
তুমিই বিশ্বাত্মা, সবে করহ চেতন,
তুমি বিশ্বমূর্ত্তি-ধারী, আশ্রিতেরে কৃপাকারী,
কৃপাসিন্ধো, বৃথা এই কুশলাকুশল
চিন্তায় কি হেতু মোর হৃদয় চঞ্চল ?
যাদবে পাণ্ডবে মোর, আছে দৃঢ় স্নেহডোর,
কৃপা করি সেই পাশ করহ ছেদন,
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন।

ত্বয়ি মেহনন্যবিষয়ামতির্ম্মধুপতেঽসকৃৎ।
রতিমুদ্বহতাদদ্ধা গঙ্গেবৌঘমুদন্বতি ॥

তুমিও তো বৃষ্ণিবংশ্য ওহে দয়াময়!
তোমাতেও হবে নাকি মোর স্নেহক্ষয়!
চাহি না চাহি না তাহা, ব্রহ্মজ্ঞানে নাহি স্পৃহা,
অনন্য বিষয়া প্রীতি রহুক তোমাতে,
তোমাতে রহিলে রবে তোমার ভক্তেতে ॥
দেহের সম্বন্ধ বলে, এতদিন যে সকলে,
হৃদয়ের ভালবাসা ছিলগো আমার,
এইবার অবসান হউক তাহার।
তোমার ভকত যারা, আত্মীয় বান্ধব তারা,
নব জীবনের এই নব স্নেহ ডোরে,
দৃঢ়রূপে চিরকাল বদ্ধ রাখ মোরে ॥
যেমন গঙ্গার জল, সিন্ধু মাঝে অবিরল,
আপনারে মিশাইয়া দিয়ে কুতূহলে,
মিশে যায় যাবতীয় নদ নদী কূলে।
তেমতি তোমার পায়, মতি রাখি সর্ব্বথায়,
সর্ব্বভক্তাশ্রয়ণীয় তুমি দয়াময়,
আপন করিয়া পাব সর্ব্ব ভক্তচয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনী
ধ্রুগ্রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোদ্বিজ সুরার্ত্তি হরাবতার
যোগেশ্বরাখিলগুরো ভগবন্নমস্তে।
হে শ্রীকৃষ্ণ! তব পদে করি নমস্কার
অর্জ্জুনের সখা তুমি, হিতকারী তার।
অবনীর দ্রোহকারী, ক্ষত্রিয়ের হত্যাকারী'
অক্ষীণ প্রভাব তব, কামধেনু জাত,
নিখিল ঐশ্বর্য্য তব করতলগত।
গো ব্রাহ্মণ দেবতার, দুঃখ ভয় নাশিবার,
জন্য, আবির্ভূত তুমি ধরণী উপর
চরণে প্রণাম তব ওহে যোগেশ্বর,
ভগবান্ অখিলের গুরু হও তুমি,
বারবার তোমার ও চরণে প্রণমি।
সমাপ্ত।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর

'উপাসনা পটল,' 'কুঞ্জবর্ণন,' 'গুরুশিষ্য সংবাদ,' 'চন্দ্রমণি', 'চমৎকার চন্দ্রিকা', 'প্রার্থনা' 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা', 'চিন্তামণি,' 'রসভক্তি চন্দ্রিকা' 'রাগমালা,' 'রসসার,' 'সিদ্ধভক্তি চন্দ্রিকা,' 'সদ্ভাব চন্দ্রিকা,' 'স্মরণ মঙ্গল', 'সাধনভক্তি চন্দ্রিকা', 'সাধ্য-প্রেম চন্দ্রিকা,' 'সূর্য্যমণি', প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা ও পদকর্ত্তা।

জন্ম—বর্ত্তমান রামপুর বোয়ালিয়া নগরের ছয় ক্রোশ ব্যবধানে গড়ের হাট নামক পরগণা মধ্যে পদ্মা নদীর তীর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে খেতরী নামক গ্রামে, মজুমদার উপাধিধারী উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভব কৃষ্ণানন্দ দত্ত নামক একজন নৃপতি বাস করিতেন। এই কৃষ্ণানন্দের ঔরসে এবং নারায়ণী দাসীর গর্ভে অনুমান ১৫৩১ কি ৩২ খৃঃ মাঘী পূর্ণিমায় গোধূলি লগ্নে (মতান্তরে, শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে) নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

মৃত্যু— খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে, কার্ত্তিকী কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে পরলোক গমন করেন।

শৈশব—নরোত্তম রাজপুত্র হইয়াও শৈশব হইতে বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী হইয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে (২০শ বিলাস) লিখিত আছে—

'নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই, শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যাঁরে কয়, শ্যামানন্দ তিঁহো হয়, ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ॥
সে তিনের অপ্রকটে, এ তিনের আবির্ভাব,সর্ব্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তিভাব॥'

ফলতঃ, নরোত্তম যে শ্রীচৈতন্যদেবের আকর্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথার প্রমাণ তাঁহার বাল্যকাল হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি পাঠ্যাবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার পারিষদগণের লীলাকাহিনী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও ব্যাকুল হইতেন। ক্রমে তিনি বৃন্দাবন ধামে গিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদগণকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন; অচিরে তাঁহার সে সুযোগও উপস্থিত হইল। নরোত্তমের পিতা, রাজকার্য্য উপলক্ষে একদিন অকস্মাৎ গৌড়ে গমন করিলে, ইহাই শুভ অবসর বুঝিয়া নরোত্তম বৃন্দাবন গমনোদ্দেশে গৃহত্যাগ করিলেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তরুণ বয়স্ক (১৮ কি ১৯ বৎসর) রাজকুমার, ভোগ সুখে জলাঞ্জলী দিয়া পদব্রজে বৃন্দাবনধামে উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীব গোস্বামী, নরোত্তমকে সাদরে গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনবাসী যাবতীয় মহানুভবের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। এই সময় লোকনাথ গোস্বামী নামক একজন 'পরম বিরক্ত' গোস্বামী বৃন্দাবনধামে অবস্থান করিতেছিলেন। নরোত্তম, তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে তিনি প্রথমতঃ অস্বীকার করেন। তদনন্তর 'যৈছে সেবা করে তাহা কহনে না যায়। গোসাঞী প্রসন্ন নরোত্তমের সেবায়॥" 'একদিন নরোত্তমে ব্যাকুল দেখিয়া। মনোরথ পূর্ণ কৈলা দীক্ষামন্ত্র দিয়া॥' ('নরোত্তম বিলাস')। দীক্ষা দানের পূর্ব্বে লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তমকে আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালনের অনুমতি প্রদান করিলে তিনি কহিলেন, 'তাহাই করিমু প্রভু যে আজ্ঞা হৈল তোর। মাথে পদ দিয়া কহ নরোত্তম মোর'॥ (অনুরাগ বল্লী)।

দীক্ষা গ্রহণের পর নরোত্তম, শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অচিরে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। গোস্বামী মহোদয় এই নিমিত্ত, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বসম্মতি ক্রমে 'দিলেন পদবী শ্রীঠাকুর মহাশয়।' তৎপরে লোকনাথ গোস্বামীর কুঞ্জে নরোত্তম ঠাকুরের সহিত

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরিচয় হইলে উভয়ে রাঘব গোস্বামীর সহিত সমগ্র বৃন্দাবন পরিক্রমণ করিয়া আসেন। ইহার অত্যল্প কাল পর শ্রীজীব গোস্বামীর কুঞ্জে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের সহিত শ্যামানন্দের (দুঃখী কৃষ্ণদাস) মিলন হয়। এখন হইতে এই তিন জন প্রীতিসূত্রে বদ্ধ হইয়া একত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দকে যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া শ্রীজীব গোস্বামী এই তিন জনকে গৌড়ভূমে ভক্তিগ্রন্থ প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। যাত্রকালে, 'লোকনাথ গোস্বামী স্নেহাবিষ্ট হৈয়া। নরোত্তমে দিলা শ্রীনিবাসে সমর্পিয়া॥ নরোত্তমে করিতে কহিলা বার বার। শ্রীবিগ্রহ সেবা সঙ্কীর্ত্তন সদাচার॥ * * শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাস নরোত্তমে। শ্যামানন্দে সমর্পি বিহ্বল মহাপ্রেমে॥" শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ দুই তোমার। সর্ব্বমতে তোমারে সে এ দোঁহার ভার॥" (নরোত্তম বিলাস)। লোকনাথ গোস্বামী নরোত্তম ঠাকুরকে আজীবন কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া অনাসক্ত ভাবে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন এবং সতত সাত্বিকভাবে অবস্থান করিয়া ভজনানন্দে কালযাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি লইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ পঞ্চকোটের দশ বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী মালিয়াড়ার নিকট গোপালপুর গ্রামে উপস্থিত হইলে তথা হইতে রাত্রিকালে গ্রন্থের গাড়ীখানি বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীরের অধীন দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। এই দারুণ দুর্ঘটনায় তিন জনেই বিব্রত হইয়া পড়িলেন, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আপাততঃ এই গাড়ীর কোন সন্ধান হইল না। এদিকে শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশ, নরোত্তম বাটী গিয়া দুই জন লোক সমভিব্যাহারে শ্যামানন্দকে তাঁহার দেশে পাঠাইয়া দিবেন। অনন্যোপায় হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য, জীব গোস্বামীর আদেশবশতঃ নরোত্তম ও শ্যামানন্দকে বিদায় দিয়া একক গ্রন্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নরোত্তম ঠাকুর অতিশয় দুঃখিতান্তকরণে শ্রীনিবাসকে পরিত্যাগ করিয়া শ্যামানন্দের সহিত খেতরী প্রত্যাগমন করিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের জনক জননী হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইলেন, ভাবিলেন এখন হইতে নরোত্তম সংসারে প্রবিষ্ট হইবেন। কিন্তু উদাসীন যুবক তাঁহাদের সে আশা পূরণ করিতে অসমর্থ; সুতরাং সুমিষ্ট বচনে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বনের কথা বিবৃত করিলেন, তিনি একবারে দেশত্যাগ না করিয়া তাঁহার দীক্ষাগুরু লোকনাথ গোস্বামীর আদেশমত রাজধানীর প্রান্তভাগে একটী 'ভজন কুটীর' নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ভজনানন্দে

কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন; কেবলমাত্র দিনান্তে একবার জনক জননীর চরণ দর্শনার্থ রাজবাটী আগমন করিতেন। ঠাকুর মহাশয় এইরূপে সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বন করিলে তাঁহার পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্তকে রাজ্যভার প্রদান করিলেন।

কিয়দ্দিবসানন্তর, ঠাকুর মহাশয় ও শ্যামানন্দ ভজন কুটীরে, আচার্য্য প্রভুর নিকট হইতে অপহৃত গ্রন্থোদ্ধারের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পরে জীব গোস্বামীর আদেশমত ঠাকুর মহাশয় দুইজন লোক সমভিব্যাহারে শ্যামানন্দকে তাঁহার স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। ঠাকুরমহাশয় তদবধি কিছুদিন অন্তরঙ্গ সঙ্গী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষুন্নমনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থল নবদ্বীপ, নীলাচল প্রভৃতি তীর্থ-দর্শনোদ্দেশে বহির্গত হইয়া যথাক্রমে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, সপ্তগ্রাম, খড়দহ, খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ ও তৎস্থানের মহানুভব গোস্বামীমহোদয়গণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে যাজপুর, গোপীবল্লভপুর এবং নৃসিংহপুরে আগমন করেন; শেষোক্ত স্থানে শ্যামানন্দের সহিত তাঁহার পুনর্মিলিন হয়। এখানে দুই চারি দিন অবস্থানের পর প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীখণ্ডে উপনীত হন। শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বাটি যাজীগ্রামে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। ঠাকুর-মহাশয় ইতি পূর্ব্বে শ্যামানন্দকে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খেতরীতে শুভাগমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছেন; এখন তিনি আচার্য্যপ্রভুকে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। যাজিগ্রাম হইতে ক্রমে কাটোয়া, একচক্রা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া খেতরিতে প্রত্যাগমন করেন।

খেতরীতে প্রত্যাগমনের পর ঠাকুর মহাশয় শ্রীবিগ্রহগণের উপযোগী মন্দিরাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরে তাহা সুসম্পন্ন করিলেন। মহাপ্রভুর জন্মতিথি আগামী ফাল্গুনী পূর্ণিমায় মহামহোৎসবের সহিত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করিবার বাসনা করিলেও শ্রীআচার্য্য প্রভুর অপেক্ষায় মহোৎসবের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বা অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না; এমন সময় ঠাকুর মহাশয় বুধরী গ্রামে আচার্য্য প্রভুর আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং তথায় উপনীত হইলেন। এইস্থানে তিনি রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত আজীবন সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। কবিরাজ মহাশয় মহোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্র করিলে, রাঢ়, বঙ্গ, উৎকল ও গৌড়ভূমে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড

প্রভৃতি স্থানের যাবতীয় গৌরভক্তকে স্বগণসহ মহোৎসবে যোগদান করিবার নিমিত্ত, তাহার অনুলিপি প্রেরিত হইল। তাহার পর আচার্য্য প্রভুর আদেশ-মত ঠাকুর মহাশয়, রামচন্দ্র কবিরাজ সমভিব্যাহারে অগ্রেই খেতরীতে প্রত্যাগমন করিয়া মহোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। যথা সময়ে আচার্য্য প্রভু খেতরীতে মহোৎসবের বিপুল আয়োজন দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। ক্রমে নানা দেশ হইতে দলে দলে অসংখ্য বৈষ্ণব মোহান্তগণ খেতরীর মহোৎসব দর্শন করিয়া ধন্য হইবার জন্য শুভাগমন করিতে লাগিলেন—নির্দ্দিষ্টদিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, খেতরী রাজধানী, অভ্যাগত বিপুল জন-সঙ্ঘের আনন্দ-কোলাহলে ততই মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কি জানি, কাহারও কোনরূপ ব্যক্তিগত অসুবিধা ঘটে, এই আশঙ্কায় সন্তোষদত্ত স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিতে লাগিলেন। বিভিন্ন-সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র ভাণ্ডার, পরিচারক প্রভৃতির বন্দোবস্ত হইল; রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ, ব্যাসাচার্য্য, শ্যামানন্দ, ইহারা স্বয়ং বৈষ্ণবমণ্ডলীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণব মোহান্তগণের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবী, পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী ও জামাতা মাধব আচার্য্য, অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর পুত্র অচ্যুতানন্দ ও গোপাল মিশ্র, চৈতন্য-ভাগবত-কার বৃন্দাবন দাস, পদকর্ত্তা বলরাম দাস, গোবিন্দ দাস ও জ্ঞান দাস, হৃদয় চৈতন্য, কৃষ্ণদাস, শ্যামানন্দ, রঘুনন্দন সরকার, লোচনানন্দ, যদুনন্দন, মনোহর দাস, পরমেশ্বরী দাস, গোকুল দাস প্রভৃতি খ্যাতনামা মহানুভববৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভক্ত পাঠকগণ এই অভূতপূর্ব্ব মহামহোৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবরণ "নরোত্তম বিলাস" প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

ফাল্গুনী শুক্লাপঞ্চমীর দিন হইতে বাদ্যোৎসব আরম্ভ হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনের প্রভাতে নবনির্ম্মিত মন্দিরষট্‌কের প্রাঙ্গণ চত্বর বিচিত্র ভূষায় বিভূষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। বিচিত্রচন্দ্রাতপতলে যাবতীয় বৈষ্ণব-মোহান্ত যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন পরিগ্রহ করিলে পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি সুসম্পন্ন করিলেন। এইরূপে গৌরাঙ্গ (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া সহ চৈতন্য দেব), বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধাকান্ত ও রাধারমণ এই ষড়বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইল।

প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেলে ঠাকুর মহাশয়, মোহন্তগণের অনুমতি অনুসারে দেবীদাস, গোকুলদাস, বল্লভদাস, গৌরাঙ্গদাস, প্রভৃতি সুকণ্ঠ

গায়ক ও সুমধুর বাদকগণ সমভিব্যাহারে স্বরচিত সুমধুর পদাবলী গাহিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুর মহাশয়, সুসম্বদ্ধ নবপ্রণালীসম্মত এক কীর্ত্তন-সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। গড়ের হাট পরগণায় উদ্ভব বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন প্রণালী 'গড়াণহাটি-কীর্ত্তন' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলী ঠাকুর মহাশয়ের স্বরচিত সুমধুর পদাবলী শ্রবণ করিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার এই নূতন সুর তাল সমন্বিত কীর্ত্তন প্রণালীর প্রশংসা সমগ্র দেশময় প্রচারিত হইয়া গেল। মহোৎসবের পর দুই দিনকাল বৈষ্ণবগণ খেতরীতে অবস্থান করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেবল মাত্র আচার্য্য প্রভু, শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি আরও কিছু দিন খেতরীতে অবস্থান করিলেন। জাহ্নবা দেবী পঞ্চমীর দিন সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ ও জ্ঞানদাস এবং জামাতা মাধব আচার্য্য সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। তদনন্তর একমাস পর আচার্য্য প্রভু ও শ্যামানন্দ, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিকট রামচন্দ্র কবিরাজকে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

'এমন ভক্ত সমাগম জনতা, এমন নৃত্য-কীর্ত্তন সমারোহ বৈষ্ণব সমাজে কোন মহোৎসবে হয় নাই, হইবে কি না জানি না। এই উৎসবে নৃত্য কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া সহস্র সহস্র লোকের জীবন-স্রোত পরিবর্ত্তিত হইল। যাহারা প্রথমে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছিল, তাঁহারাও প্রেমাশ্রুসলিলে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল। শত শত দুষ্ক্রিয়াসক্ত দস্যু, তস্কর, পাষণ্ড নরোত্তমের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিল।' (শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত পৃঃ ২২১)

'এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যে একটী পথপ্রদর্শক আলোক স্তম্ভস্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণব মধ্যে পরিচিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি; ইহারা ছায়ার ন্যায় ত্বরিত গতিতে আমাদের দৃষ্টি হইতে সরিয়া পড়িলেও সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা তাঁহাদের উত্তরীয় বস্ত্রে ১৫০৪ শক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি; এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ৩৫০)

মহোৎসবান্তে ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত, খেতরী হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী তাঁহার স্বরচিত 'ভজনস্থলী' নামক নির্জ্জন স্থানে নানাবিধ

ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ভজন সাধন করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন। ইতিমধ্যে ঠাকুর মহাশয় রামচন্দ্র সমভিব্যাহারে আচার্য্য প্রভুর বিষ্ণুপুরের মহোৎসবে গমন করিয়াপ্রত্যাবর্ত্তন কালে পুনরায় নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া আসেন।

'ক্রমে ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব এতদুর বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক তাঁহার নিকট দীক্ষা-মন্ত্র লইতে আসিত। সৎকুলজাত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং সম্ভ্রান্ত রাজা জমিদার মন্ত্রশিষ্য হইয়া ঠাকুর মহাশয়ের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ কুলোদ্ভব ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য হইতে লাগিলেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে ঠাকুর মহাশয়ের অসামান্ত সাধুতা ও মহত্ব দর্শনে তাঁহাকে আর কেহ সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করিত না। (শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত)

গেয়াস গ্রাম নিবাসী শিবানন্দ আচার্য্যের পুত্রদ্বয় হরিনাম ও রামকৃষ্ণ, গাম্ভীলা গ্রামবাসী সুপণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, ও দিগ্বিজয় পণ্ডিত রূপনারায়ণ প্রভৃতি খ্যাতনামা পণ্ডিতমণ্ডলী এবং রাজা নরসিংহ, চাঁদরায়, হরিশ্চন্দ্র রায় প্রভৃতি রাজা জমিদারগণ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। অনেক দস্যু তস্করও ঠাকুর মহাশয়ের পুণ্য প্রভাবে নবজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিছুকাল পরে রামচন্দ্র কবিরাজ আচার্য্য প্রভুর সহিত বৃন্দাবনে গিয়া দেহত্যাগ করেন; আচার্য্য প্রভুও কিছু দিন পরে অপ্রকট হন। ঠাকুর মহাশয় এই হৃদয়বিদারক নিদারুণ সংবাদে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার অবস্থার কথা তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন,

"গৌরাঙ্গ সহচর,　শ্রীনিবাস গদাধর,　নরহরি মুকুন্দ মুরারী।
শ্রীস্বরূপ দামোদর,　হরিদাস বক্রেশ্বর,　এসব প্রেমের অধিকারী॥
করিলা যে সব লীলা,　শুনিতে গলয়ে শীলা,　তাহা মুঞি না পাই দেখিতে॥
তখন না হল জন্ম,　না বুঝিনু সেই ধর্ম্ম,　এই শেল রহি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন রূপ,　রঘুনাথ ভট্টযুগ,　ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি,　কৈলা কি মধুর কেলি,　বৃন্দাবন ভক্তগণ সাথ॥
সভে হৈলা অদর্শন,　শূন্ত ভেল ত্রিভুবন,　আঁধল হইল এনা আঁখি।
কাহারে কহিব দুঃখ,　না দেখাব ছার মুখ,　আছি যেন মরা পশু পাখী॥
আচার্য্য শ্রী শ্রীনিবাস,　আছিনু যাঁহার পাশ,　কথা শুনি যুড়াইত প্রাণ।

তেঁহ মোরে ছাড়ি গেল, রামচন্দ্র না আইল, দুঃখে জিউ করে আন চান ॥
যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা, এছার জীবনে নাহি আশা।
অন্ন জল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই, ধিক, ধিক নরোত্তম দাস।"

অনন্তর তিনি সশিষ্য গাম্ভীলা গ্রামে গিয়া কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে স্বইচ্ছায় গঙ্গালাভ করেন। প্রতি বৎসর খেতরীতে এতদুপলক্ষে একটি সুবৃহৎ মেলার অধিষ্ঠান হইয়া থাকে। এই সময় অসংখ্য বৈষ্ণব সমবেত হইয়া খেতরীতে মহোৎসব করিয়া থাকেন।

দেহ ত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঠাকুর মহাশয়ের কয়েকটী অলৌকিক ক্রিয়ার কথা বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

'ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার অতি বৃহৎ। রাজসাহী, মালদহ, বহরমপুর, রঙ্গপুর, পাবনা প্রভৃতি স্থান ঠাকুর মহাশয় উদ্ধার করিয়াছেন। অধিক কি, মণিপুরের রাজারা তাঁহার পরিবার। (নরোত্তম চরিত)'

সাহিত্য-সেবা—ঠাকুর মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্যে মহাপণ্ডিত হইলেও জনসাধারণের জন্য তিনি সরল বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যাবতীয় ভক্তিশাস্ত্র এবং ভজন মার্গের পারদর্শী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার হৃদয় নিঃসৃত বাণী দ্বারা সংসারাসক্ত মানবহৃদয় সঞ্জীবনী অমৃতধারায় অভিসিঞ্চিত হইলে এক সুমধুর ভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। তাঁহার ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় গ্রন্থই প্রত্যেক নরনারীর আদরের বস্তু। ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা'র মত মর্ম্মস্পর্শী ও চিত্তদ্রবকারী প্রার্থনা সাহিত্য জগতে অতি বিরল। এই প্রার্থনা গুলি সাধারণতঃ, প্রবর্ত্ত দশা (ক্রিয়ারম্ভ,) সাধক দশা (ক্রিয়া সাধন), ও সিদ্ধদশা (সেবা অভিলাষ) সাধকের এই তিন দশার পর্য্যায় অনুসারে বিরচিত। এই স্থানে কয়েকটি মাত্র প্রদত্ত হইল—

১

"হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন বাসী। নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি ॥
তেজিয়া শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ ॥
ষড়রস ভোজন দূরে পরিহরি। কবে ব্রজে খাইব করিয়া মাধুকরী ॥
কনক ঝারির জল দূরে পরিহরি। কবে যমুনার জল খাব কর পূরি ॥
পরিক্রম করিয়া ফিরিব বনে বনে। বিশ্রাম করিব গিয়া যমুনা পুলিনে ॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশী বটে। কবে ব্রজে বসিব সে বৈষ্ণব নিকটে ॥
[illegible] কবি পরিহর। কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥

২

করঙ্গ কৌপীন লৈয়া, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া, তেয়াগিয়া সকল বিষয়। কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয়॥ হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন। ফল মূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥ শীতল যমুনা জলে, স্নান করি কুতূহলে, প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈয়া। বাহুপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া॥ দেখিব সঙ্কেত স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব। কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গিরিবরধারী, কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব॥ মাধবী কুঞ্জের পরি, সুখে বসি শুক শারী, গাইবেক রাধাকৃষ্ণ রস। তরুমূলে বসি ইহা, শুনি যুড়াইবে হিয়া, কবে সুখে গোঞাব দিবস॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ, দেখিব রতন সিংহাসনে। দীন নরোত্তম দাস, করয়ে দুর্লভ আশ, এ মতি হইবে কত দিনে॥

৩

হরি হরি আর কি এমন দশা হব। এভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি, আর কবে ব্রজভূমে যাব॥ সুখময় বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন, সে ধূলি লাগিব কবে গায়। প্রেমে গদ গদ হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া, কান্দিয়া বেড়াব উভরায়॥ নিভৃতে নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া, ডাকিব হা রাধানাথ বলি। কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে খাব করপুটে তুলি॥ আর কি এমন হব, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দেব তায়। বংশীবট ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া, পড়িয়া রহিব কবে তায়॥ কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি, রাধাকুণ্ডে কবে হবে বাস। ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে, আশা করে নরোত্তম দাস॥

৪

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। জীবন মরণে আর গতি নাহি মোর॥ কালিন্দীর কূলে কেলি কদম্বের বন। রতন বেদীর উপর বসাব দু'জন॥ শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥ গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বূলে॥ ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাস অনুদাস। সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস॥

ঠাকুর মহাশয়ের রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া তৃপ্তিলাভ করা যায় না। এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক একটী পদ উদ্ধৃত হইল—

"কাঞ্চন দরপণ, বরণ সুগোরারে, বরবিধু জিনিয়া বয়ান। দুটি আঁখি নিমিখ মুরথবর বিধিরে, না দিলে অধিক নয়ান॥ হরি হরি কেনবা জনম হইল মোর। কনক মুকুর জিনি, গোরা অঙ্গ সুবলনী, হেরিয়া না কেনে কৈলাম ভোর॥ ধ্রু॥ আজানুলম্বিত ভুজ, বনমালা বিরাজিত, মালতী কুসুম সুরঙ্গ। হেরি গোরা মুরতি, কত শত কুলবতী, হানত মদন তরঙ্গ॥ অনুক্ষণ প্রেমভরে সে রাঙ্গা নয়ন ঝরে, না জানি কি রূপে নিরবধি। বিষয়ে আবেশ মন, না ভজিনু সে চরণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি॥ নদীয়া নাগরী, সেহ ভেল ব্রজপুরী, প্রিয় গদাধর বাম পাশ। মোহে নাথ অঙ্গীকরু, বাঞ্ছা কলপ তরু, কহে দীন নরোত্তম দাস।"

'হাট পত্তন' ক্ষুদ্র কবিতা হইলেও বৈষ্ণব সমাজে ইহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। 'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' গ্রন্থখানি ঠাকুর মহাশয়ের পরিণত বয়সের রচনা। তাঁহার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় শেষবার বৃন্দাবনে গমন করিলে তিনি যখন একাকী অবস্থান করিতেন, কাহারও সহিত বড় বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন না—'প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' গ্রন্থখানি সেই সময় রচনা করেন। এই গ্রন্থে ঠাকুর মহাশয় 'নৈষ্ঠিক ভজন' 'রাগের ভজন' প্রভৃতি ভজনতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন—

"কর্ম্মী জ্ঞানী মিছা ভক্ত, না হইবে অনুরক্ত, শুদ্ধ ভজনেতে কর মন। ব্রজ জনের যেই মত, তাহে রবে অনুগত, এই সে পরম তত্ত্বধন॥ প্রার্থনা করিবে সদা, শুদ্ধভাবে প্রেম কথা, নাম মন্ত্রে করিয়া অভেদ। একান্ত করিবে মন, ভাব রাঙ্গা শ্রীচরণ, গ্রন্থি পাপ হবে পরিচ্ছেদ॥ * * জল বিনা যেমন মীন, দুঃখ পাপ আয়ুহীন, প্রেম বিনা সেই মত ভক্ত। চতক জলদ গতি, এমতি প্রেমের রীতি, জানে যেই সেই অনুরক্ত॥ মকরন্দ ভ্রমে যেন, চকোর চন্দ্রিমা হেন, পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পতি। অন্তরে না চলে মন, যেন দরিদ্রের ধন, এই মত প্রেম ভক্তি রীতি।"

অন্যত্র—

"জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তি যোগ, নানা মতে হইয়ে অজ্ঞান। তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি, প্রেম ভক্তি পরম কারণ॥ জগৎব্যাপক হরি, অজভব আজ্ঞাকারী, মধুর মূরতি সার লীলা। এই তত্ত্ব জানে যেই, পরম

মহৎ সেই, তার সঙ্গ করিব একলা॥ পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, তাহে রহু মনতুষ্ট, ভজ তাতে ব্রজ-ভাব হয়ে। রসিক ভকতি সঙ্গে, রহিবা পিরীত রঙ্গে, ব্রজপুরে বসতি করিবে॥ আর কথা না শুনিব, আর কথা না কহিব, সকলি কহিব পরমার্থ। প্রার্থনা করিব যথা লালসা হে কৃষ্ণকথা, ইহা বিনু সকলি অনর্থ।”

বাহুল্য ভয়ে, ঠাকুর মহাশয় বিরচিত অপরাপর গ্রন্থ হইতে আর উদ্ধৃত হইল না। ‘রসসার’ গ্রন্থে রাধিকার প্রেম, ভজন পদ্ধতি, চৌষট্টি ভজনাঙ্গ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত আছে।

শ্রীশিবরতন মিত্র।

ভাগবত ধর্ম্ম

বর্ত্তমান যুগের যাহা যুগধর্ম্ম শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে তাহাই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শাস্ত্র সমূহে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ কথিত হইয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে তাহার ধ্বংস করা হয় নাই, সেই সমস্ত উপদেশের মধ্যে তাহাদের সার্থকতা ও চরম লক্ষ্যরূপে যে তত্ত্ব লুকায়িত ছিল, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে সেই তত্ত্বকে স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই পরম তত্ত্বের নাম প্রেম, একমাত্র শ্রীভগবানই ইহার বিষয়। এই প্রেমকেই পঞ্চম পুরুষার্থ বলে।

যতক্ষণ সূর্য্যদেব উদিত না হয়েন, ততক্ষণ নক্ষত্রগণ আলোক দান করিয়া মানবের যে আলোকের প্রয়োজন তাহা কিয়ৎপরিমাণে পূর্ণ করিয়া থাকেন, কিন্তু সূর্য্য উদিত হইলে নক্ষত্রগণ যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বা পলায়ন করে, তাহা নহে, তবে সূর্য্যের উজ্জ্বল আভায় মলিন হইয়া পড়ে ও সূর্য্যের আলোক যাহার চক্ষুতে লাগিয়াছে সে আর নক্ষত্রগণকে দেখিতে পায় না, বরং নক্ষত্রগণের দ্বারা এতক্ষণ কোন প্রকারে যে কার্য্য সাধিত হইতেছিল, সূর্য্যালোকে তাহা সুশৃঙ্খলায় ও সুন্দররূপে সাধিত হয়। এখন জগতে যদ্যপি এমন কেহ থাকেন, যিনি সূর্য্য উদিত হইলেও তাহা দেখিতে পাইতেছেন না, তাহা হইলে নক্ষত্র-কিরণেই তাঁহাকে নিজের কার্য্য চালাইতে হইবে। সেইরূপ প্রেমের কথা জগতে প্রচারিত হওয়ার পর, একমাত্র যিনি প্রেমদাতা তিনি মানবের দ্বারে বিচরণ করিয়া

যাচিয়া যাচিয়া নির্ব্বিচারে সকলকে এই প্রেমধন বিতরণ করার পরেও যদি কেহ এই প্রেমধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনুভব করিতে না পারেন, তাহা হইলে অহঙ্কারের ভূমিতে দণ্ডায়মান থাকিলে যাহা হয়, তাঁহারও তাহাই হইবে অর্থাৎ তিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের উপাসনা করিবেন। যাঁহারা আত্ম-রক্ষার জন্য ব্যাকুল ও সর্ব্বদা চেষ্টান্বিত তাঁহাদের নিকট এই প্রেমধর্ম্মের কথা বর্ণনা করা একেবারে নিরর্থক। যাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপায় এই প্রেমের আভাসমাত্র প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের, তাঁহারা এক-শ্রেণীর নূতন জীব। তাঁহারা নিজের জন্য কিছুই চাহেন না, স্বর্গ, মোক্ষ, ঐশ্বর্য্য কিছুই চাহেন না, নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। একমাত্র প্রেমাস্পদ প্রেমদাতা শ্রীভগবান যেমন তাঁহার এই বিশ্বলীলায় নিজের অচিন্ত্য ও অনমুমেয় মাধুর্য্য রাশি বিতরণ করিয়া নিখিল চরাচরের ক্ষুদ্র পরমাণুটি পর্য্যন্ত অমৃতায়মান করিবার জন্য নিত্য ব্যাকুল, এই ব্যাকুলতায় তাঁহার অধরে যেন আর সুধারাশি ধরিতেছে না, সর্ব্বদা উথলিয়া উথলিয়া উঠিতেছে, আর তিনি সেই উচ্ছ্বলিত অধর-সুধা বংশীরবের সাহায্যে অর্থাৎ আদিভূত যে আকাশ, তাহার ধর্ম্ম যে শব্দ, সেই শব্দকে আশ্রয় করিয়া নিখিল ভূতগ্রামকে প্রেমময় করিতেছেন, এই জন্যই সেই বংশীবাদনকারী হরি ভূতভাবন।

কিন্তু এই ভাবটুকু, এক শ্রীভগবান বা তাঁহার ভক্ত ছাড়া আর কেহ কাহারও মধ্যে জাগাইতে পারেন না। আত্মবিসর্জ্জনেই সুখ, আত্মরক্ষায় নহে, সুখবাঞ্ছা না থাকাই, কোটিগুণ বা অমিত সুখলাভের একমাত্র উপায়, এ কথা কেহ কাহাকেও তর্ক দ্বারা বা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারেন না।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম হইতে মুখ্যরূপে এই প্রেমের কথাই কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে শৌণকাদি ঋষিগণের প্রশ্নের উত্তরে সূত কর্ত্তৃক কথিত শ্লোক কয়েকটি আলোচনা করা হইয়াছে। নিম্নের শ্লোকে পূর্ব্বের কথাই দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং ॥”

ধর্ম্ম বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবানের লীলা-কথায় যদ্যপি রুচি না হয় তাহা হইলে সেই ধর্ম্মবিষয়ক শ্রম বিফল শ্রম মাত্র। শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন যে, যে ধর্ম্মের লক্ষ্য মোক্ষ তাহাও বিফল শ্রম। ‘কেবল’ পদের দ্বারা ইহাই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। স্বর্গাদি যে ফল তাহা ক্ষয়শীল

'এব' পদের দ্বারা তাহার নিরাকরণ হইয়াছে। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য যজ্ঞ করেন তাঁহাদের এই সুকৃত অক্ষয় হইয়া থাকে। (অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি) বস্তুতঃ তাহা হয় না, ইহাই প্রতিপাদন করার জন্য "হি" এই শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। আসল কথা এই, যে ইহলোকে যেমন কর্ম্মের দ্বারা অধিকৃত লোকের (সম্পদের) ক্ষয় হইয়া থাকে, পরলোকে পুণ্যের দ্বারা উপার্জ্জিত লোকেরও সেইরূপ ক্ষয় হইয়া থাকে।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভক্তির অজন্যতা ও মৌলিকতা সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বশ্লোকে ও বর্ত্তমান শ্লোকে তাহাই প্রতিপাদিত হইল। বর্ত্তমান শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী মহাশয় উপসংহারে বলিলেন "শ্লোকদ্বয়েন ভক্তিনিরপেক্ষা জ্ঞানবৈরাগ্যে তু তৎসাপেক্ষে ইতি লভ্যতে!" অর্থাৎ জীবের যাহা একমাত্র কল্যাণ তাহা ভক্তিদেবীই অপর কাহারও সাহায্য না লইয়া সাধন করিয়া থাকেন, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যে আমাদের কল্যাণ করেন তাহাতে তাঁহারা ভক্তিদেবীর অপেক্ষা রাখেন অর্থাৎ রাজরাজেশ্বরী শ্রীভক্তিদেবী তাহাদের পশ্চাতে ও সম্মুখে বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের কার্য্য সম্ভব করেন।

শ্রীজীব গোস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছেন যে শাস্ত্রকার "এব" শব্দের দ্বারায় প্রবৃত্তি লক্ষণ যে কর্ম্ম তাহার ফলে যে স্বর্গাদি লোক তাহার ক্ষয়িষ্ণুত্ব প্রতিপাদন করিলেন। "হি" শব্দের দ্বারায় যেমন ইহলোকে কর্ম্মজিত লোকসমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে সেইরূপ, এই কথা বলিলেন। আর "কেবল" এই অব্যয় শব্দটির দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে কেবলমাত্র নিবৃত্তি মাত্র লক্ষণ যে ধর্ম্ম তাহার ফলে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। যে জ্ঞান হয় তাহা নশ্বর। "হি" শব্দের দ্বারা বেদের একটি প্রমাণের কথা সূচিত হইয়াছে, তাহা এই—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

এইবার আমরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা অনুসারে এই শ্লোকটির মর্ম্ম আলোচনা করিলে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত যে যুগধর্ম্ম তাহার তত্ত্ব অনেকটা বুঝিতে পারিব।

রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবা সূত পরধর্ম্ম কি তাহাই বর্ণনা করিতে গিয়া

বলিলেন, যাহা হইতে শ্রীভগবানে অহেতুকী ও অব্যবহিতা ভক্তি জন্মায় তাহাই পর ধর্ম। এ প্রকারের উত্তর পূর্ব্বে দেওয়া হইত না। পূর্ব্বে বলা হইত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই পর ধর্ম। শ্রীমদ্ভাগবত অবশ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যে কিছুই নহে এমন কথা বলেন নাই, তবে অবশ্য এ কথা বলিয়াছেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উদ্দেশ্য নহে, উপায়। উদ্দেশ্য এই প্রেম। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধি নিষেধ অনুসারে নিত্য নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে "নিত্য সিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম" যাহা মানবের প্রকৃতির গূঢ়তম স্থলে নিহিত আছে, তাহার যদ্যপি উপলব্ধি হয় এবং যদি এই উপলব্ধি হরি কথায় যে আত্যন্তিক অনুরাগ, সেই অনুরাগের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে তাহা হইলেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সার্থক, নতুবা কতকগুলি নিয়ম কেবলমাত্র অন্ধভাবে পালন করিয়া যাওয়াই পরম পুরুষার্থ নহে। কথাটা আরও স্পষ্টরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে। আমি ব্রাহ্মণ, পাঁজি পুঁথিতে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই আমি পালন করিতেছি, কিন্তু আমার বড় অভিমান আমি ব্রাহ্মণ, আমি পা দুখানি সর্ব্বদা বাড়াইয়াই আছি, অন্য সকলে আমাকে প্রণাম না করিলে ক্রোধ হয়। যত দিন যাইতেছে বিষয়াসক্তি ততই বাড়িয়া যাইতেছে, সংসারকে একেবারে কামড়াইয়া ধরিয়া আছি, যেমন অহঙ্কার তেমনি ভোগলালসা, অন্য বর্ণের লোক যদ্যপি কোন ভাল কথা বলে বা ভাল কাজ করে তাহা সহ্য করিতে পারি না, মনে করি ও লোককে বলি, বড় কথা ও ভাল কথা বলার অধিকার আমাদের একচেটিয়া, স্বর্গ বা মোক্ষ আমাদের জন্য পৃথক্ করিয়া রাখা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বলিয়া যে অধিকার, পুরাতন পুঁথির বচন আবৃত্তি করিয়া তাহা আদায় করিয়া আত্মপুষ্টি করিব, সমাজের নিকট বড় হইব, কিন্তু ব্রাহ্মণের যেটুকু দায়ীত্ব অর্থাৎ ত্যাগপরায়ণ ও তপস্বী হইয়া পরার্থে জীবন যাপন করা তাহা করিব না। যদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপালনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারের অবস্থা হয়, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ঐ যে স্বধর্ম্মপরায়ণতা উহা ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র, বিফল পরিশ্রম। অন্ধভাবে উহা পালন করিলে লোক ঠকাইয়া দুপয়সা রোজগার হইতে পারে কিন্তু উহাতে অহঙ্কার বাড়িয়া অমঙ্গলই হইতেছে।

আমরা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকার আলোচনা করিতে গিয়া এতগুলি কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই যে এই স্থানে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকায় এমন একটি কথা আছে, যাহা প্রথমটা পড়িয়া স্থূলদর্শীর মনে হয় যে তিনি

বুঝি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নিন্দা করিলেন। ধীরভাবে সমস্তটুকু আলোচনা করিলে বেশ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনি বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিন্দা করেন নাই, তবে পূর্ব্বে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের যে অপব্যবহারের কথা বলা হইল, যাহা নামে ধর্ম্ম হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মের বিপর্য্যয় তিনি বিশেষভাবে তাহার নিন্দা করিয়াছেন। এমন কি সেরূপ অবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবার উপদেশও তিনি প্রদান করিয়াছেন।

আসল কথা এই যে ভক্তের ভাব হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ অহঙ্কার বর্জ্জন করিয়া, নিরভিমান ও পরার্থপর হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। তাহা হইলে চিত্তশুদ্ধ হইবে। শুদ্ধচিত্তে বিষ্ণুর পরমপদ প্রকাশিত হইবে। তখন কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া মানব স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিকগণের অনুষ্ঠেয় যে ভাগবত ধর্ম্ম তাহাতে প্রবেশ করিবেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার টীকায় বলিতেছেন ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অনুষ্ঠিত যে ধর্ম্ম (শাস্ত্রে উপদিষ্ট কর্ত্তব্য) তাহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি হরি কথায় রতি না জন্মায় তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিস্ফল পরিশ্রম মাত্র। এই স্থলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন "তস্মাৎ স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণঃ পূর্ব্বোক্তঃ পরোধর্ম্মঃ এবানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ" তাহা হইলে তিনি বলিতেছেন 'যদি রতি না জন্মায়'—তাহা হইলে।

যাঁহারা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উপদেশ গ্রাহ্য করেন, তাঁহারা যদ্যপি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দেশে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা মুখ্যরূপে প্রেমভক্তিতে লোকের চিত্তকে আর্দ্র করিতে চেষ্টা করুন। ভগবান মধুময়, প্রেমময়, করুণাময়, তাঁহার নামগুণ লীলা প্রভৃতি কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে মানবচিত্তে প্রেমের উন্মাদনা আনিতে চেষ্টা করুন। যদি প্রেমের উন্মাদনা আসে এবং সেই প্রেমের অবিরোধী ভাবে এবং সেই প্রেমকে মুখ্য করিয়া তাহার অধীন বা পরিপোষক করিয়া এই বর্ণাশ্রম রক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইবে, নতুবা তাঁহারা বিফল চেষ্টা করিয়া নিজের ও অপরের ক্ষতি করিবেন।

প্রেম হৃদয়ে না জাগিলে অহঙ্কার কিছুতেই চূর্ণ হইবে না। অহঙ্কার চূর্ণ না হইলে উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোককে ঘৃণা করিবে। ফলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা উঠিলেই গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে। উচ্চ বর্ণের সহিত নিম্নবর্ণের সম্বন্ধ কি ? উচ্চ বর্ণের লোকেরা পরার্থপর হইয়া নিম্নবর্ণের লোকের যাহাতে

কল্যাণ হয় সে জন্য চেষ্টা করিবেন, পিতা যেমন নিজে পরিশ্রম করিয়া পুত্রের পালন ও পোষণ করেন, সেইরূপ। উচ্চ বর্ণের লোকেরা, আমরা উচ্চবর্ণ বলিয়া অহঙ্কার করিয়া (তথা কথিত) নিম্নবর্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিবেন, আর জীবনে 'পয়সা পয়সা' করিয়া স্বার্থান্বেষণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন, কাজের মধ্যে একবার কোশাকুশি লইয়া ঠক্‌ঠক্ করিয়া লোক ঠকাইয়া ছানা মাখন জোগাড় করিবেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও সর্ব্বনাশ, সমাজেরও সর্ব্বনাশ, একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হইতে হইবে, ভক্তি ছাড়া মানুষ পরার্থপর হয় না, হইতে পারে না, প্রেমছাড়া পরের জন্য খাটিতে পারে না। সুতরাং ভক্তির আদর্শ দেশে সর্ব্বাগ্রে ও মুখ্যরূপে প্রচার হওয়া দরকার।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকায় তিনি বলিতেছেন যে মূলেই ভক্তি থাকা চাই, নতুবা সকল কর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম বিফল। এই মতের বিরুদ্ধে কেহ কেহ বলেন যে কেন, এই প্রকারের শাস্ত্র-বাক্য আছে যে

"অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া॥"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, নিষ্পাপ ও পবিত্র চিত্ত হইয়া স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি হইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভক্তির হেতু রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে অহেতুকী বলা যায় কিরূপে?

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন, এই শ্লোকে বলা হইল নিষ্কাম কর্ম্মযোগ জ্ঞানের জনক বা উৎপাদক ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে ভক্তিরও যে জনক তাহা বলা হয় নাই। কারণ "যদৃচ্ছয়া" এই পদটি যে রহিয়াছে। অর্থাৎ ভক্তি দেবী দৈবে আসিতে পারেন, এই কথা বলা হইল। যদি ভগবৎ কৃপায় শুদ্ধা-ভক্তির প্রবেশ হয় তাহা হইলেই নিষ্কাম কর্ম্মী তাহা পাইবেন, নতুবা নহে। এই-বার চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার সকল কথার উপসংহার করিয়া বলিতেছেন "পরমধর্ম্মাদন্যো যো বর্ণাশ্রমাচারলক্ষণঃ স্বনুষ্ঠিতো নিষ্কামোঽপি ধর্ম্মো বিশ্বক্সেন-কথাসু রতিং প্রীতিং নোৎপাদয়েৎ স কেবলং শ্রম এব যদি ইতি" অর্থাৎ 'যদি' এই পদটির অর্থ বিচার করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় এক অতি সুন্দর সিদ্ধান্ত করি-লেন। তিনি বলিলেন যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণ যে পরধর্ম্ম তাহার কথা তো পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাহা কখনই বিফল হইবে না। এই যে শ্লোক ইহার তাৎপর্য্য শুদ্ধাভক্তির অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। মনে করুন আমি হরিকথা

শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণ যথারীতি করিতেছি অথচ রতি জন্মিতেছে না, সে স্থানে এই শ্লোকের দোহাই দিয়া আমি বলিতে পারি যে তাহা হইলে আমার বিফল পরিশ্রম হইতেছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন, না, ইহা বিফল পরিশ্রম নহে, বোধ হয় যথারীতি শ্রবণ কীর্ত্তন হয় নাই, বোধ হয় অপরাধ হইতেছে, হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, অপরাধ দূর কর, শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি পরিত্যাগ করিও না, ইহাকে পণ্ডশ্রম মনে করিও না, ইহা হইতে সমস্তই সিদ্ধ হইবে। এই যে পণ্ডশ্রমের কথা বলা হইল ইহা ঐ পরধর্ম্মের ব্যতিরিক্ত যে বর্ণাশ্রমাচার তাহারই সম্বন্ধে জানিতে হইবে, সে ধর্ম্ম যদি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত ও নিষ্কাম হয় তাহা হইলেও হরিকথায় রতি না হইলে বিফল জানিতে হইবে।

পূর্ব্বের কথাগুলি একটু ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা দরকার। যাঁহারা কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমের আচার গুলিকেই মুখ্য বলিয়া ধরিয়া আছেন, তাঁহারা হয় ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথায় কিছু অসন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাঁহার কথাগুলি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের অন্যান্য কথার সহিত মিল করিয়া দেখা দরকার। নিম্নের লিখিত কথাগুলি সকলে বেশ ধীরভাবে আলোচনা করিলে বড়ই ভাল হয়।

আমরা ধর্ম্ম করিতেছি। কি করিতেছি? না, মালা লইয়াছি; তিলক করি, তিনবার স্নান করি, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব বিচার, খুব আঁটাআঁটি, মন্ত্র জপ করি, স্তব পাঠ করি, পূজা করি। কিন্তু কার্য্যগুলি সমস্তই শারীরিক অর্থাৎ কেবলমাত্র শরীরের দ্বারা এই অনুষ্ঠানগুলি পালন করিয়া যাইতেছি, মনের বা হৃদয়ের কোনরূপ অনুশীলন হয় না। দোকান করিয়াছি, কি করিয়া দোকান চলিবে, এ জন্য তন্ময় হইয়া ভাবি, ছেলেটির অসুখ হইয়াছে হৃদয় উদ্বেগে কাতর হইয়াছে, এ সকল ব্যাপারে মানসবৃত্তির বা হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন আছে কিন্তু ধর্ম্ম ব্যাপারটা একটা শারীরিক ব্যাপার মাত্র। আমাদের দেশে অনেকেরই এইরূপ অবস্থা। একটা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার দুই পক্ষের প্রমাণাদি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া কত চিন্তা ও আলোচনা দ্বারা সত্যাসত্য বা হিতাহিত বা ন্যায় অন্যায় নিরূপণ করি, কিন্তু অধ্যাত্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলে সাহস করিয়া সত্যান্বেষণ করিতে পারি না! তখন মনে করি এ সম্বন্ধে যাহা পাইয়াছি, তাহাই ঠিক, এ বিষয়ে কোনরূপ বিচারণা করার দরকার নাই। এ জায়গায় মানসবৃত্তির অনুশীলন করিতে ভয় পাই। একজন ব্যবসায়ীকে তাহার ব্যবসায় সম্বন্ধে যত প্রশ্ন করা যাউক সে ধীর ভাবে তাহা শুনিবে, সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবে, ও চিন্তা করিয়া সত্য নির্ণয় করিবে, সে জায়গায় সে অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত

একটা মতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কার্য্য করিতে পারে না, বিনা বিচারে পরের কথা মানিয়া লইতে পারে না। তাহার মানসিক বৃত্তির যতটুকু বিকাশ হইয়াছে, তাহার ষোল আনা খরচ করিয়া সে প্রত্যেক কথার ও প্রত্যেক কার্য্যের সত্যাসত্য যাচাই করিয়া লয়। কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই ব্যক্তিরই অবস্থা অন্যরূপ, এখানে তাহার কোন উদ্বেগ নাই। একজন লোক তাহাকে একটা কথা শিখাইয়া দিয়াছে, গোটাকতক কার্য্য বলিয়া দিয়াছে সে তাহা করিয়া যায়, কেন করে, ইহা করিয়া কি হইবে তাহা সে ভাবেও না, ভাবিতে চায়ও না। কেন এরূপ হয়। সাংসারিক ব্যাপারে বিনা বিচারে যে এক পদও চলিতে পারে না, পরমার্থ বিষয়ে সে বিচার করে না কেন? ইহার একমাত্র প্রকৃত উত্তর এই যে সে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে পরমার্থে বিশ্বাস করে না, পরমার্থের সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই, তবে যে ধর্ম্ম করে, ইহা কতকটা সংস্কারের বশে, কতকটা জনসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবার জন্য, আর কতকটা 'কি জানি কিসে কি হয়?' এই প্রকারের সন্দেহ নিবন্ধন। ইহলোককে সে সত্য বলিয়া জানে, ইহলোকে তাহার স্বার্থ আছে, পরমার্থকে সে জানে না, মানেনা, কাজেই তাহাতে তাহার স্বার্থ নাই, এই জন্যই ধর্ম্ম একটা শারীর ব্যাপার।

কর্ম্মের এইরূপ দুর্দ্দশা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে অনেক স্থানেই তাহা দেখান হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞ বর্ণনায়, ও বিপ্র পত্নীগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষায় এই তত্ত্ব অতীব বিশদভাবে বলা হইয়াছে। জ্ঞানমার্গ ইহার প্রথম প্রতিবাদ, জ্ঞানমার্গে বলা হয়, "গঙ্গাসাগরেই গমন কর, আর ব্রত পরিপালন বা দানই কর, জ্ঞান ছাড়া কিছুতেই কিছু হইবে না।" অর্থাৎ মানুষ তো কেবল শরীর নয়, যে কেবলমাত্র কতকগুলি শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা ধর্ম্মমার্গে উন্নতি লাভ করিবে।

ভক্তি ইহার শেষ ও চরম প্রতিবাদ। কেবলমাত্র জানিয়া কর্ম্ম করিলেই হইবে না। মানবের সত্তা ভাবময়, ভাবুক হইতে হইবে, যিনি পরমার্থ সত্য তিনি রসময়, ভাব না থাকিলে রসের আস্বাদন হয় না।

পূর্ব্বে আমরা নবধা ভক্তি সম্বন্ধে শ্রীজীব গোস্বামীর যাহা অভিমত তাহা বর্ণনা করিয়াছি। সেখানে দেখান হইয়াছে যে তিনি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, এই নবধা ভক্তির মধ্যে স্মরণকেই মুখ্যস্থান দিয়াছেন ও শ্রবণ কীর্ত্তনের মধ্যেও স্মরণ আছে তাহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ পূজার সময় যেমন মন্ত্র পড়ি, আর মন বাজারে মাছ কিনিয়া বেড়ায়, ভক্তি সাধনায় তাহা হয় না। শ্রবণ কীর্ত্তনাদির যে শ্রেষ্ঠতা বলা হইল, তাহা কেবল

কাণে একটা আওয়াজ বাজানো, বা জিহ্বায় একটা শব্দ করা মাত্র নহে, তাহার মূলে স্মরণের দ্বারা একাগ্র হইয়া ভক্ত তাঁহার সমগ্র মানসবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তি লইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলা প্রভৃতিতে এই প্রকারে তন্ময় হওয়া ও মত্ত হওয়া সহজেই হইতে পারে, বিশেষতঃ যদি ভক্ত সাধুর সঙ্গ হয়, তাহা হইলে সাধনার এমন সুগম ও সুন্দর পথ আর নাই। তাহার পর এই সাধনায় আগে ভগবানকে জানিয়া লইয়া শ্রবণাদি সাধনভক্তির কার্য্য আরম্ভ হইল। ভগবানকে মানিয়া লইলে, অহঙ্কার তৎক্ষণাৎ অপগত হইল, বিশ্বকল্যাণের মধ্যেই আপনার প্রকৃত কল্যাণ দেখিতে পাওয়া গেল, সিদ্ধি, ভুক্তি বা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকিল না, একমাত্র বাসুদেব পরিতোষণই লক্ষ্য হইয়া পড়িল। তখন জ্ঞান ও বৈরাগ্য আপনা হইতেই উপস্থিত। ভক্ত সাধুগণ আমাদের দুর্ব্বল ও সমাজ বিপ্লবে জর্জ্জরীভূত অথচ তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য জীব-বৃন্দের জন্য এই যে অহেতুকী ভক্তির সাধন পথ, এই যে প্রেমের ধর্ম্ম দিয়াছেন, ইহাই আমাদের একমাত্র কল্যাণের উপায়। এই ভক্তিপথ অগ্রে স্বীকার করিয়া বর্ণাশ্রমাচার পালন করাই ভাল, তবে যদি দুই তাল রাখিতে কেহ না পারে তাহা হইলে স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া আজকালকারদিনে এই অহেতুকী ভক্তির সাধনা করাই নিরাপদ, ইহাই যেন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শ্লোক অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষক যদ্যপি রাজভক্ত হয় তাহা হইলে ভূমিকর্ষণ করিয়া লাভবান হইতে পারে, নতুবা সে পরিশ্রম করিয়া ভূমি কর্ষণ করিল, বীজ বপন করিল, জল সিঞ্চন করিল, শস্যও হয়ত হইল, কিন্তু রাজা তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া ক্ষেত্র অপরকে প্রদান করিলেন ; সুতরাং কৃষিতে প্রীতি রাজপ্রীতি উৎপাদন করে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিতেছেন,—"তথৈব হরৌ ভক্তিং বিনা প্রবৃত্তনিবৃত্তধর্ম্মফলয়োঃ স্বর্গাদিজ্ঞান-য়োরলাভাৎ শ্রমঃ।" "যথা চ কৃষৌ প্রীত্যনুরোধাদেব নৃপে প্রীতিঃ নতু বস্তুত তথৈব ধর্ম্মে প্রীত্যনুরোধাদেব তৎকথাসু প্রীতির্নতু বস্তুত ইতি বিবেচ-নীয়ং।" এই উক্তির দ্বারা বর্ণাশ্রমাচারের সহিত পরাভক্তির যে সাধন তাহার সমন্বয় করা হইয়াছে। ধর্ম্মে আমাদের প্রীতি আছে, কারণ ধর্ম্মের দ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয় হয়। কৃষিতে কৃষকের প্রীতি আছে কারণ কৃষির দ্বারাই তাহার জীবিকার্জ্জন হয়। হরি কথায় যে রতি তাহা প্রথমাবস্থায় এই ধর্ম্মে প্রীতির অনুরোধে হয়। এই প্রকারে শ্লোকটির ব্যাখ্যা

করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে রতির কথা বলিলেন তাহা ঔপাধিকী, তাত্ত্বিকী নহে। যাঁহারা বিবেকী তাঁহারা জানেন যে হরি কথায় রতি ব্যতিরেকে ধর্ম্ম বিফল, এই জন্য হরি কথায় রতি করেন। যাঁহারা অবিবেকী তাঁহারা ইহা না জানায় তাঁহাদের স্বধর্ম্মাচরণ ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র হয়।

পূর্ব্বের তত্ত্বটুকু আর এক ভাবে বুঝিতে পারা যায়। "স্বধর্ম্ম" বলিতে কি বুঝায়? জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মবাদ স্বীকার না করিলে স্বধর্ম্ম বলিয়া একটা কথাই থাকে না। জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া কর্ম্মের বিধান ক্রমে জীবমাত্রেই ক্রম বিকাশ লাভ করিতেছে, প্রকৃতির ক্ষেত্রে অস্ফুট সচ্চিদানন্দ জীব প্রোথিত হইয়া ক্রমে প্রস্ফুট হইতেছে। আমাদের অতীত ইতিহাস বা পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের কর্ম্মসমষ্টি আমাদিগকে ক্রমবিকাশের একটা নির্দ্দিষ্ট সোপানে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। যে কার্য্য সাধন করিলে, আমি এক্ষণে যে সোপানে আছি ঠিক তাহার পরের সোপানে যাইতে পারিব, তাহাই আমার স্বধর্ম্ম। সুতরাং 'স্বধর্ম্ম' পালন মানবের ক্রমবিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও নিরাপদ পথ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কে আমায় বলিয়া দিতে পারে ইহাই আমার স্বধর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ে যে বর্ণবিভাগ রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে সকলেই একরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। সমাজ যাহাকে ব্রাহ্মণ বলে তাহার মধ্যেও অনেক শূদ্র আছে, আবার সমাজ যাহাকে শূদ্র বলে তাহার মধ্যে অনেক ব্রাহ্মণ আছে। ইহা ছাড়া বর্ণসঙ্করের তো কথা নাই। সুতরাং পূর্ব্বে যে বিভাগ শিশু মানবাত্মার পক্ষে অশেষ রূপে হিতকর ছিল, এখন অনেক স্থলেই তাহা সার্থকতাহীন ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ এই পদ্ধতি একেবারে চূর্ণই বা করা যায় কিরূপে? ইহা অপেক্ষা নিশ্চয়ই ভাল হইবে এ প্রকারের কোন্ পদ্ধতি না পাইলে এ পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া ফেলাও যায় না। ভাঙ্গিতে গিয়া অনেক সময়ে দেখা যাইতেছে, ভাল তো হইল না বরং আরও খারাপ হইয়া গেল। বর্ণবিভাগ ভাঙ্গিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেখা গেল জন্মগত আভিজাত্যের পরিবর্ত্তে ধনগত আভিজাত্য আসিয়া সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। যাহা ছিল তাহাই যেন ভাল ছিল। ইহাই তো অবস্থা।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের মত সকলে চিন্তা করিয়া দেখিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম, ধর্ম্ম এই দুইভাগে বিভক্ত। আমি ক্রমবিকাশের যে সোপানে দাঁড়াইয়াছি সেই সোপান হইতে ঠিক পরের সোপানে যাইতে

হইলে আমাকে যে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে তাহাই আমার স্বধর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্ম অহংনিষ্ঠ। এই স্বধর্ম্ম বর্ণে বর্ণে পৃথক। যেমন বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক, যিনি যে শ্রেণীতে পড়েন তিনি সেই শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক আয়ত্ত করিলে পর পরের শ্রেণীতে উন্নীত হইবেন ইহাই স্বধর্ম্ম। শ্রেণী বিভাগ যদি ঠিক হয় তাহা হইলে এই ব্যবস্থা বেশ ভাল। পরধর্ম্ম শব্দের অর্থ ভাগবত ধর্ম্ম। শ্রীভগবানকে একমাত্র সত্য জানিয়া কেবল মাত্র তাঁহারই চরণ-পদ্ম পাইবার জন্য যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায় তাহার নাম পরধর্ম্ম। পরধর্ম্ম বা ভাগবত ধর্ম্ম যেন যাবতীয় স্বধর্ম্মের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক, (Lowest Common multiple) পরধর্ম্মই ধর্ম্ম সাধনার চরম অবস্থা, সকল অধ্যাত্ম সাধনার পরিণতি। স্বধর্ম্মের গম্য স্থান পরধর্ম্ম। সমুদ্র মধ্যে রাত্রিকালে নাবিক যদ্যপি পথ হারাইয়া ফেলে তাহা হইলে সে ধ্রুব-তারায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং নিরাপদে গম্যস্থানে উপস্থিত হয়, সেইরূপ আমরা যখন স্বধর্ম্ম-সঙ্কটে পড়িয়াছি, তখন এই পরধর্ম্মকে আদর্শরূপে পুরোদেশে রক্ষা না করিলে আমাদের আর মঙ্গল নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কলি-যুগ আরম্ভ হইলে পর এই স্বধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হয়, অবশ্য তাহার পূর্ব্ব হইতে এই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময়ে তাহা যেন অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে, এই সময়ে ভাগবত শাস্ত্র অন্ধকার রাত্রির অবসানে সূর্য্যদেবের মত সমুদিত হইলেন। এই ভাগবত ধর্ম্ম ঠিক সূর্য্যের মত, কিন্তু আমাদের যেন চক্ষু ছিল না, তাই এই সূর্য্যকিরণেও নিজের কর্ত্তব্য পথ অবধারণ করিতে পারি নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আসিয়া আমাদিগকে চক্ষু দিলেন, ভাগবত ধর্ম্ম কি তাহা জীবকে শিখাইলেন। যেমন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার বলিতেছেন।

"দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎ কার॥
এক ভাগবত এই ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস পাত্র॥"

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যুগে আমরা এই ভাগবত ধর্ম্মের ফলিত অবস্থা দেখিতে পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মেরও প্রকৃত মর্ম্ম আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আবার এই ধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছে, এই পুনরুত্থানের মধ্যেই হিন্দু সমাজের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত

আছে। মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিলেই ভাগবত ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্মের সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যাইবে।

আমরা যেভাবে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বুঝি তাঁহারা যে ঠিক সেভাবে বুঝিতেন না ইহা নিশ্চয়; আবার ইহাও নিশ্চয় যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ কর্ত্তৃকই যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বুঝিলেই আমরা শ্রীভাগবত বুঝিব, শ্রীভাগবত বুঝিলেই আমরা যুগ ধর্ম্মের পরিচয় পাইব এই যুগ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তনেই আমাদের প্রকৃত কল্যাণ হইবে।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে এই যে পরধর্ম্ম ইহা অত্যন্ত দুরূহ, ইহাতে আমাদের অধিকার নাই। একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা অন্ধ। আমাদের যোগ্যতার দ্বারা অবশ্য আমরা এ অধিকার পাই নাই তবে স্বয়ং ভগবান অশেষ করুণা করিয়া নিজগুণে আমাদিগকে এ অধিকার দান করিয়া গিয়াছেন। বর্ণাশ্রমের অবজ্ঞা করিবেন না, এই বর্ণাশ্রমাচার আমাদের পিতা ও মাতা, কিন্তু এই বর্ণাশ্রমের যাহা সার্থকতা সেই ভাগবত ধর্ম্মের, সেই প্রেম-ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করুন, অচিরেই আমাদের কল্যাণ হইবে। প্রেম-ভক্তিকল্পতরু শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রই আমাদের এই বিরাট হিন্দু সমাজের ত্রাণ-কর্ত্তা, তিনিই আমাদের সকলের আশ্রয়। কবি শ্রীপ্রেমানন্দ সত্যই বলিয়াছেন—

"এ মন গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হ'য়েছে,
হেন প্রেম পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে।
হরি নাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে॥
ভব বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম
জগতে ফেলিল ঢালি,
কাঙ্গালে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে
বাজাইয়ে করতালি॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।

চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল করতালে
গাহিয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে
কপাট হানিল দ্বারে ॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল
উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দে, এমন গৌরাঙ্গে
রতি না জন্মিল তোর ॥”

উৎকণ্ঠিতা রাধা

পথে আজি চাহ ক্ষণে ক্ষণে,
ব্যাকুল করুণ দুনয়নে,
হে সজনি তার লাগি, সারা রাতি আছ জাগি
সে কি ফিরে আসিবে ভবনে,
দূর পথে চাহ ক্ষণে ক্ষণে।

নীরব হয়েছে চারিধার,
কোথাও দেখি না লোক আর,
শয়নে গিয়াছে সুখে তরুণীরা হাসি মুখে
ঘরে ঘরে রুদ্ধ দেখি দ্বার,
গ্রাম পথে লোক নাহি আর।

এখনো তোমারি গৃহ-কোণে,
দীপ জ্বলে অয়ি সুলোচনে,
বাতাস বহিছে মন্দ মৃদু অগুরুর গন্ধ
মগ্ন তুমি সুখের স্বপনে,
প্রদীপ জ্বলিছে গৃহ-কোণে।

তুমি আজি প'রেছ সুন্দরী,
কতনা গরবে নীলাম্বরী,
দেখ তব মনো ভুলে অবগুণ্ঠ গেছে খুলে
অঞ্চল লুঠিছে পদ'পরি,
একমনা হে মুগ্ধ সুন্দরি।

মুখে তব চন্দ্রকর মাখা,
সীমন্তে সিন্দুর বিন্দু আঁকা,
কাঁপে এলায়িত চুল দুটী কানে জোড়া দুল
কঙ্কনে বাজিছে আজি শাঁখা,
চোখে তব সুখস্বপ্ন আঁকা।

মালা যে গেঁথেছ নানা ফুলে,
তারি তরে রাখিছ কি তুলে,
থাক তবে বসে থাক ভুলে যেন শুয়ো নাক
তন্দ্রায় প'ড়না যেন ঢুলে,
মালা খানি যত্নে রাখ তুলে।

যমুনা বহিছে কলগানে,
হে সজনি শুনেছ কি কানে,
শুধুই বাঁশিটি তার আজিকে বাজেনা আর
রাধা নামে সুমধুর তানে,
হে সজনি শুনেছ কি কানে।

মাঠ পারে ডুবে যায় শশী,
এখনো সে এলনা রূপসি,
তুমি কতক্ষণ আর আশা পথে চেয়ে তার
শূন্য মনে একা রবে বসি,
মাঠ পারে ডুবে গেল শশী।

শ্রীপ্রভাসকুমার সেন।

শব্দব্রহ্ম

পূর্ব্বানুবৃত্ত

এইরূপে বেদতরু প্রকাশিত হইয়া তিনটী মহাশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল, পুনঃপুনঃ লুপ্তপ্রায় হইয়াও ভারতে তাহার পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়া ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গের দ্বারা সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। আর সেই বৈদিকযুগে অজ্ঞ অশিক্ষিত সমাজ বৈদিক ভাষার অনুকরণে স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশের চেষ্টা করিত, এই কারণ বশতঃই হউক বা সম্প্রদায় বিচ্ছেদ বশতঃই হউক, যে কোনও কারণে সেই বৈদিক ভাষার ক্রমে অপভ্রংশ হইয়া প্রাকৃতাদি নানা আকারে রূপান্তরিত হইয়াছিল, আর মূলভাষা ব্যাকরণাদি দ্বারা সংস্কৃত হইয়াও সেই বৈদিক ছন্দে, বৈদিক ভাবে, বৈদিক রীতিতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। এই-রূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে হইতে দীর্ঘকালের পর আবার সে তরু আরও একটুকু বিকাশ প্রাপ্ত হইল। শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক বৈদিক ভাষা সহসা রসাত্মক বাক্যে পরিণত হইয়া আর এক নূতন ভাব ধারণ করিল। আদি বীর করুণ প্রভৃতি রসে অনুপ্রাণিত হইয়া নির্জীব ভাষা যেন সজীব হইয়া উঠিল। শ্লেষাদি অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া মানব মণ্ডলীর মনোহরণ করিতে লাগিল। ভাষাতরুর পুষ্পের বিকাশ হইল।

একদা মধ্যাহ্নকালে মহর্ষি বাল্মীকি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে স্নানার্থ তমসা-নদীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন এক ব্যাধ ক্রীড়াসক্ত ক্রৌঞ্চ যুগলের মধ্যে ক্রৌঞ্চটীকে বাণ বিদ্ধ করিয়া নষ্ট করিল। তদ্দর্শনে মুনিহৃদয় শোক অভিভূত হইলে সহসা তিনি করুণ রসাকুলিত চিত্তে বলিয়া উঠিলেন।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চ মিথুনাদেক মবধীঃ কামমোহিতম্।"

বাক্যটী সহসা উচ্চারিত হইবামাত্র মহর্ষি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ভাষা যে এইরূপ ছন্দে সুবদ্ধ ও সরস হইয়া ব্যক্ত হইতে পারে তাহা তিনি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। "অকস্মাৎ শব্দব্রহ্মের ঈদৃশ বিবর্ত্তের কারণ কি ?" ইহাই তখন তাঁহার চিন্তার একমাত্র বিষয় হইয়া পড়িল। এমন সময়ে লোক পিতা-মহ ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মহর্ষে! তুমি শব্দাত্মকব্রহ্মে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। তোমার মুখ হইতে শব্দব্রহ্মের ঈদৃশ পরিবর্ত্তন হইয়া এরূপ গাথার আবির্ভাব, আমার ইচ্ছাতেই সংঘটিত হই-

য়াছে। তুমি প্রথম কবি হইলে। আজ অঙ্কুর স্বরূপ যে শ্লোকটী তোমার মুখ হইতে আবির্ভূত হইলে ; ইহাই অবলম্বন করিয়া এইরূপ সুললিত ছন্দে তুমি আদর্শ পুরুষ ভগবান রামচন্দ্রের চরিত্র বিস্তৃতরূপে কীর্ত্তন করিয়া রামায়ণ প্রকাশ কর। আমার বরে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই প্রত্যক্ষের ন্যায় তোমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে ; আর যে পর্য্যন্ত পৃথিবী থাকিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার কীর্ত্তি জাজ্বল্যমান রহিবে। এই গাথাটী যখন শোক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তখন এরূপ গাথা অদ্যাবধি শ্লোক নামে অভিহিত হইবে।" এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন, বাল্মীকিও তদনুসারে রামায়ণ রচনা করিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ভাষার কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, দেশকাল ও পাত্রের সমবায়ে উহার স্বতঃ প্রকাশ হয় মাত্র ; তৎসম্বন্ধে এ উপাখ্যানটীও একটী জ্বলন্ত উদাহরণ। তবে বৃক্ষের যেমন শাখাপ্রশাখা পত্র পল্লব প্রভৃতি যথাকালে স্বয়ং আবির্ভূত হয়। মানব শিশুর দন্ত গুম্ফ শ্মশ্রু প্রভৃতি যেমন যথাকালে উদ্ভুত হইয়া তাহার অবয়বের পূর্ণতা সম্পাদন করে, ইহাতে যেমন কাহারও কোনও চেষ্টার আবশ্যকতা থাকে না, তদ্রূপ বৈদিক ভাষারূপ শরীরির এতকাল পরে "মানিষাদ" শ্লোকাকারে আর একটী নূতন অবয়বের আবির্ভাব হইল। কারণ শব্দে ও অর্থে বৈদিক ভাষার সহিত সাম্য থাকিলেও এই শ্লোকের মধ্যে কতকগুলি নূতনত্ব আছে, যাহা দেখিয়া ঋষি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ছন্দের নূতনত্ব, বৈদিক ভাষায় অনুষ্টুভ্ প্রভৃতি সমস্ত ছন্দ আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে লঘু গুরু ও অক্ষর সংখ্যাদির কোনও সুশৃঙ্খলা না থাকায় তাহা এরূপ সুখশ্রাব্য নহে। ২য়তঃ শোক ক্রোধ স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি নিরাকার মনোবৃত্তিগুলিকে ভাষার ছাঁচে ঢালিয়া তাহাদের প্রতিমা গঠন করিতে পারা যায়, এবং তদ্দারা অন্যের অন্তঃকরণে সেই সেই মনোবৃত্তিগুলিকে সংক্রামিত করিতে পারা যায়, ইহা ইতি পূর্ব্বে কাহারও ধারণা ছিল না। ৩য়তঃ একটী শব্দের দ্বারা অনেক অর্থ ধ্বনিত হইতে পারে, বৈদিক ভাষাতে এরূপ অর্থান্তর ধ্বনি ছিল না। এই শ্লোকটী একটি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু তদ্দারা অন্য একটি অর্থের বোধ জন্মাইতেছে, যেমন—

"হে মানিষাদ" অর্থাৎ লক্ষ্মীর আশ্রয়ভূত নারায়ণ, তুমি অনন্তকালের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, কেন না কামমোহিত অর্থাৎ ত্রিভুবনের আধিপত্যেও যাহার বাসনার তৃপ্তি নাই, সেই ক্রৌঞ্চ অর্থাৎ কুটিলাচারী রাক্ষস দম্পতীর মধ্যে ক্রৌঞ্চটিকে বধ করিয়াছ, এই অর্থটি ধ্বনিত হইতেছে। এইজন্যই এই শ্লোকটিকে রামায়ণের বীজ স্বরূপ বলা হইয়াছে। তাই মহর্ষি এই শ্লোকটিকে অবলম্বন করিয়া

ভাষার দ্বারা মনোভাবের এমন সব মূর্ত্তি গঠন করিতে বসিলেন, বোধ হয় মানব সমাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকিতে আর সে মূর্ত্তির বিলয়ের সম্ভাবনা নাই। তিনি তাঁহার মহাকাব্যে অমৃতস্রাবিনী ভাষায় পিতৃভক্তি, সৌভ্রাত্র, সতীত্ব ও রাজধর্ম্মের আদর্শ চিত্রগুলি অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়া কাব্য জগতে প্রথম পথ প্রদর্শক হইলেন, এইজন্যই তাহাকে কবি গুরু বা আদি কবি বলে।

তৎপরে যে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব বেদের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, যে তত্ত্ব ধ্যাননিষ্ঠ ঋষি ব্যতীত অপর সাধারণের দুরধিগম্য, সেই বেদার্থতত্ত্ব সাধারণের সুগমের জন্য, আর অতি প্রাচীন কালের আর্য্যজাতির ইতিহাস প্রকাশের জন্য, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস আদি কবি বাল্মীকির পদাঙ্কানুসরণ করিয়া অষ্টাদশ পুরাণ উপপুরাণ আর যাহাতে একাধারে কাব্য পুরাণ ইতিহাস রাজনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান, সেই ভারতের সর্ব্বস্ব মহাভারত রচনা করিয়া মহর্ষি বাল্মীকির নিকট আসন গ্রহণ করিলেন। এদিকে পাণিনীয়াষ্টাধ্যায়ীর বৃত্তিকার মহর্ষি কাত্যায়ন সপ্তলক্ষ শ্লোকাত্মক "বৃহৎ কথা, নামক এক আখ্যায়িকা প্রণয়ণ করেন; যে বৃহৎ কথাগ্রন্থের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ সংগ্রহ করিয়া অধস্তন কবি সোমদেব ভট্ট কথা, সরিৎসাগর ও বাণ ভট্ট কাদম্বরী রচনা করিয়া কাব্য জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত আরও অনেক মহর্ষি বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া তৎকালে সংস্কৃত ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া গিয়াছিলেন।

আবার কিছুকাল পরে ভাষাশিল্পের আরও একটু বৈচিত্র সম্পাদিত হয়। ব্যাস বাল্মীকির পদ্য অনুসরণ রামায়ণ মহাভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অবলম্বন করিয়া মাঘ ভারবি কালিদাস প্রভৃতি শত শত কবি অসংখ্য কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া সাহিত্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। পূর্ব্বে পৌরাণিক যুগে প্রাকৃত ভাষা লিপিবদ্ধ করার রীতি প্রচলিত ছিল না, অধস্তন কবিগণ তাহা সংস্কৃতের সহিত একত্র ব্যবহার করিয়া কিম্বা কেবল প্রাকৃত ভাষায় কাব্য নাটকাদি প্রণয়ণ করিলেন। সেই প্রাকৃত ভাষার অপভ্রংশ হইতে হইতে আজ ভারতে দেশ-ভেদে অসংখ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, আজ যে বঙ্গভাষার উশৃঙ্খল ঈদৃশ পরিণতি, ইহার পূর্ব্ব পুরুষের অনুসন্ধান করিতে করিতে অগ্রসর হইলে আমরা সেই প্রাকৃত ভাষাতে গিয়া উপনীত হইব, তথায় থাকিয়া ক্রমপরিবর্ত্তন না দেখিয়া যদি হঠাৎ বঙ্গভাষার দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে বোধ হয় ইহাকে সেই বংশীয় নয় বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। যদি সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখা যায় তবে বোধ হয় প্রমাণিত হইতে পারে যে পৃথিবীর যাবৎ ভাষারই মূল সেই প্রাচীন বৈদিক ভাষা,

আবার তাহার ও মূল সেই সূক্ষ্ম ওঁকার। সেই ওঁকারই আজ বিস্মৃত হইয়া এই বিরাট শব্দরাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার পরেও যে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তাহা কে বলিতে পারে।

সম্পূর্ণ

শ্রীদক্ষিণাচরণ কাব্যতীর্থ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

শ্রীমহাপ্রভু ও রামানন্দ রায় সম্বাদ।

প্রভু পূর্ব্ব রীতিতে অর্থাৎ এক হস্তে কৃষ্ণনাম গণন এবং কোটি ডোরে সংখ্যা রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিয়ড় নামক বণিক তাঁহার স্ত্রীর সহিত এই ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহাকে জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র বলে। প্রভু এই শ্লোকটির দ্বারা নৃসিংহ দেবের স্তব করিলেন। "যথা শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধের ৯ অধ্যায় প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন

"উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী।"
কেশরীব স্বপোতানামন্যেষামুগ্র বিক্রমঃ ॥ ২॥

অয়ম্ নৃকেশরী (শ্রীনৃসিংহদেবঃ) স্বপোতানাং (নিজ শাবকানাং সম্বন্ধে) কেশরী (সিংহ) ইব, স্বভক্তানাং সম্বন্ধে (উগ্রোঽপি দুরাধর্ষোঽপি) অনুগ্রঃ (মৃদুতম) এব। অন্যেষাং সম্বন্ধে (উগ্রবিক্রম) ইব প্রতীয়তো অন্যেষাং কিং ভক্তদ্বেষিণাং। অস্য বঙ্গার্থঃ লিখ্যতে।

সিংহ যেমন আপনার পুত্রের প্রতি শান্ত বলিয়া এবং হস্তীশাবকের প্রতি অশান্ত বলিয়া অনুভূত হন, শ্রীনৃসিংহ দেবও সেইরূপ আপন ভক্তের নিকট কমনীয়, মনমোহন মূর্ত্তিতে এবং অভক্তদিগের নিকটে অতি কঠিনরূপে প্রতীত হন। সিংহের যেমন আপনার শাবক ও পরের শাবকের নিকট রূপের কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয় না, তবে ভাবের কাঠিন্য ও সারল্য অঙ্গে উদয় হয় এবং তদ্রূপে কার্য্য হইয়া থাকে সেইরূপ ভাবময় শ্রীনৃসিংহ দেব ভাবগ্রাহী প্রযুক্ত, ভক্ত ও অভক্তের হৃদয়ে পৃথক্‌রূপে প্রতীত হন।

পিত্ত-দূষিত জিহ্বাতে মিছরি দানা তিক্ত বলিয়া অনুভূত হয়, তজ্জন্য মিছরি দানার দোষ নহে, জিহ্বারই দোষ যেমন সেইরূপ স্বতঃ প্রতীত হয়।

পরম সুকোমল বপুঃ শ্রীনৃসিংহ দেব বজ্র হইতে কঠিন অভক্তের হৃদয় দোষে কঠিন বলিয়া অনুভূত হন। যেমন মিছরি দানা আস্বাদ করিতে করিতে জিহ্বার পিত্তদোষ শোধিত হইয়া রসাস্বাদ সমর্থতা জন্মায়, সেইরূপ ভগবানকে ভজন করিতে করিতে কঠিন হৃদয় প্রেমরূপ উষ্মাতে গলিয়া যায়।

আরও সিংহ যে নখর ও দন্ত দ্বারা হস্তীর মজ্জা বিদীর্ণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ হস্তীর মজ্জা বিদারণ সময়ে সেই নখর ও দন্ত বজ্রের সদৃশ হয় এবং বিপক্ষ সিংহাদির হস্ত হইতে যখন নিজ শাবককে একটি গুহা হইতে অপর গুহায় লইয়া যান, তখন সেই নখর ও দশন সুকোমল হইয়া থাকে। একই নখ দন্ত, পৃথক্ স্থানে যেমন পৃথক্ ক্রিয়া করিতেছে। সেইরূপ শ্রীনৃসিংহ দেবকে অভক্ত সকল আপনাদের হৃদয় দোষে কঠিন হইতে কঠিন বলিয়া অনুভব করেন।

কলিযুগ-পাবন মহাপ্রভু, শ্রীনৃসিংহ দেবকে দণ্ডবৎ করিলেন, যদিও নৃসিংহ দেব তাঁহার অংশ বিশেষ তাহা হইলেও ভক্ত মর্য্যাদা বজায় রাখিলেন। "মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে" এই পয়ার শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীজগদানন্দ শিক্ষায় শ্রীমুখে বলিয়াছেন। কারণ—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই কথাও শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু ভক্তের ভাব দেখাইলেন। শ্রীনৃসিংহ দেবের সেবক তৎপরে মাল্য ও প্রসাদ দিয়া প্রভুকে সম্মানিত করিলেন। কোন বিপ্র ভিক্ষা দান করিলেন, প্রভুও প্রসাদ আস্বাদ করিয়া সেই রাত্রি তথায় অবস্থান করিয়া গমন করিলেন। প্রভু গমন করিতে করিতে এবং তত্রস্থ লোক সকলকে বৈষ্ণব করিয়া শ্রীগোদাবরী তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী নদীর জল দেখিয়া প্রভুর যমুনা স্মৃতি হইল এবং তত্তীরে বনকে শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া অনুভব করিলেন। "মহা-ভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম, সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্ট স্ফূরণ" কারণ—মহাভাগবতের সর্ব্বত্র ইষ্ট সম্বন্ধ স্ফুর্ত্তি হইয়া থাকে। এখানে ভাগবত ও মহাভাগবত সম্বন্ধে আমরা বিচার করিব, শ্রীমদ্ভাগবতের নবযোগেন্দ্র সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়। তাহা এই। শ্রীহরি যোগেন্দ্র মহাশয় প্রথমতঃ ভাগবত সকলকে ৩টি আখ্যা দিলেন, উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত। যাঁহারা শ্রীগোবিন্দ প্রতিমাতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক

পূজাদি করিয়া থাকেন কিন্তু ভক্ত ও অভক্তকে, সম্বন্ধ হইতে দূরে দর্শন করেন, তাহাদিগকে প্রাকৃত ভক্ত কহা যায়, আর—

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিনেষু দ্বিষৎসু চ।"
প্রেম মৈত্রী কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি সমধ্যমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে প্রেম, বৈষ্ণবে বন্ধুত্ব, মূর্খের প্রতি কৃপা এবং ভক্তদ্বেষীকে ঘৃণা করেন তাঁহারা মধ্যম বলিয়া কথিত হন। প্রাকৃত ও মধ্যম ভক্ত ভক্তিদেবীর ক্রমবিস্তারে উত্তমত্ব লাভ করিয়া থাকেন। জগৎই ভগবানের নিত্যদাস ইহা অনুভব না হইলে আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না এবং আত্মতত্ত্ব, না জানিলে, শ্রীভগবৎতত্ত্বে প্রবেশাধিকার হয় না। এইটি প্রাকৃত ও মধ্যম ভক্তের না থাকায় তাঁহাদের বিভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে।

অতঃপর উত্তম ভাগবত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন যথা,—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাব মাত্মনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।

এস্থলে আমরা স্বামীর ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের টীকা আলোচনা করিব। যিনি আপনার প্রেমের উৎকণ্ঠতা দ্বারা জগতের জীব সকলে এবং স্থাবরে সেই শ্যাম নটবর স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন, আপনাতে কৃষ্ণদাসরূপে এবং ভগবানের তত্ত্বের মধ্যে বিশ্বকে এবং বিশ্বের তত্ত্বাভ্যন্তরে ভগবান্‌কে দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম, বৈষয়িক জ্ঞান যেমন বিষয়কে চক্ষুদ্বারা দর্শন এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করান, প্রেমও সেইরূপ ভক্তি চক্ষুদ্বারা ভক্তকে আপনার লীলা মাধুর্য্য অনুভব করান, ভক্ত কখন দেখিতেছেন মা যশোদা, গোপালকে বন্ধন করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়া কাঁন্দিতেছেন। আবার মহারাস মণ্ডলে গোপী গোবিন্দের নৃত্য দর্শন করিয়া হাস্য করিতেছেন তখন অক্রুরের রথে, কৃষ্ণ দর্শন করিয়া উন্মত্ত হইয়া ধাবিত হইতেছেন। যেমন প্রহ্লাদের হৃদিগত প্রেম হিরণ্যকশিপুকে স্তম্ভ মধ্যে নরসিংহ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া "সর্ব্ব বিষ্ণুময় জগৎ" এই বেদ বাক্য প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন এবং মা, যশোদা গোপালের বদন মধ্যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন এবং ব্রজরাখাল সকল বনভোজন কালে গোপালকে বেষ্টন করিয়া মধ্যে বসাইয়া সকলে গোপাল আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন এই অপূর্ব্ব দৃশ্য অনুভব করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহা-ভাগবতগণ স্থাবর জঙ্গম কৃষ্ণময় দর্শন করেন। শ্রীধর স্বামী টীকার পরব্রহ্ম বাদ

করায় এস্থলে নন্দনন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এবং তাঁহারই স্বরূপ দর্শন হয় ইহা নির্ণীত হইল, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ একটি পয়ার বলিতেছেন, যে,—

স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

অন্য দেবতার উপাসক ও অন্য দেবতাময় দর্শন করেন এক কথায় বলিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণেই সকল দেবতার মূল পরতত্ত্ব স্বরূপ।

এ স্থলে শ্রীমহাপ্রভুও আজ মহাভাগবতগণের অন্তঃতত্ত্ব জগতে প্রকট করিলেন, কারণ নিজে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া প্রেম আস্বাদ করিয়া বিলাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু গোদাবরী পার হইয়া স্নান করিলেন এবং ঘাট ছাড়া হইয়া জল সন্নিধানে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শ্রীরামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া স্নান করিতে আসিলেন, বাদ্য সকলও সেই সময় বাদিত হইতেছিল, প্রভু চিনিলেন 'এই'ই' রাম রায় সার্ব্বভৌম ইঁহার সহিত মিলিবার জন্য বলিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তিনি তাঁহারই অধীনে বিদ্যানগর শাসন করিতেন, এই জন্যই তাঁহাকে মহারাজা বলা হইয়াছে। তিনি নির্ব্বিকার-চিত্ত রাগানুগাভক্তিমার্গে গোবিন্দ ভজন করিতেন। শ্রীরামানন্দ রায় স্নান করিয়া বিধিপূর্ব্বক তর্পণাদি করিলেন। এস্থলে সংশয় হইতে পারে রামানন্দ 'ত' দেব পিতৃকের ঋণী নহেন তবে বৈধিভক্ত্যঙ্গ যাজনা করিলেন কেন? শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা"
মৎকথা শ্রবণাদৌবা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে"

অর্থাৎ যাবৎ আমার কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা না জন্মায় এবং সংসারে বিরাগ না জন্মায় তাবৎ কর্ম্মাদি করিবে—এস্থলে পাণিনি সূত্রে বলিতেছেন "যত্তদোঃ নিত্যসম্বন্ধঃ" এইজন্য কথা শ্রবণরূপা রতির সহিত বিরাগের সম্বন্ধ আছে, যেখানে কৃষ্ণকথা সেই খানেই বিষয় বার্ত্তা লোপ, এইজন্য শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন;—

"কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার
যাহা কৃষ্ণে তাহা নাই মায়ার অধিকার"

কারণ—আরও বলিয়াছেন "শ্রুতি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে"
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ।

বেদ পুরাণ প্রভৃতি আমার বাক্য যিনি তাহার বিপরীত আচরণ করেন তিনি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় এবং আমাতে অবিশ্বাস করায় বৈষ্ণব নহেন। আবার বলিতেছেন—"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্"

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।

যিনি কর্ম্ম সকলের গুণ দোষ জ্ঞাত হইয়া সমস্ত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করেন তিনিই সাধু-শিরোমণি, যেমন কৃষকেরা বীজ বপন করিলেও বৃষ্টি অভাবে শস্য হয় না, সেইরূপ কর্ম্ম সকলও হীনবলতা প্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে ফল দিতে পারে না কারণ —"তৎকর্ম্ম হরিতোষণং যৎ" যাহাতে গোবিন্দ তুষ্ট না হন সে কর্ম্ম কর্ম্মই নহে।

কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও ভক্ত প্রত্যবায়ী হন না, কারণ প্রেম নিজ বল প্রকাশ করিয়া কর্ম্মত্যাগ করান। এইটী প্রেমের বল, কৃষ্ণও প্রেমাধীন, প্রেমভক্তি গোবিন্দের প্রতি প্রীতি বিস্তার জন্য গোবিন্দের এই আজ্ঞাটী ভক্তের হৃদয় হইতে লইয়া শ্রীগোবিন্দে উপহার প্রদান করিয়া থাকেন। এইটী পূর্ব্বপক্ষ ইহার আমরা উত্তরপক্ষ মীমাংসা করিব। অর্থাৎ শ্রীরামানন্দ কেনই বা তর্পণ করিয়া ছিলেন।

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ।

দেখা দিয়ো দয়া ক'রে

যবে ফুরাইবে বেলা সাঙ্গ হ'বে খেলা
রবি যাবে অস্তাচলে,
নীরব হইবে কর্ম্ম-কোলাহল
শ্যাম-ছায়া সন্ধ্যাতলে।
যবে নিস্পন্দ হইবে কর্ম্মক্লান্ত দেহ
শুইব নিদ্রার ক্রোড়ে,
হে দয়িতপতি, তখন আমায়
দেখা দিয়ো দয়া করে'।
যবে এ বিশ্ব-সংগীতে মিশিবে না সুর
ছিন্ন হবে হৃদি-তার,
নীরবে কাঁদিয়া নীরবে মিশাবে
বাজিবে না কভু আর।
যবে আঁধার-জড়িত নয়নেতে আমি
শুইব শান্তির ক্রোড়ে,—
হে চিরবাঞ্ছিত, তখন আমায়
দেখা দিয়ো দয়া করে'।

শ্রীপ্রমদাপ্রসাদ মল্লিক।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত মঙ্গলডিহি গ্রাম নিবাসী দুইশত বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শ্রীল শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর বিরচিত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণভক্তি—রসকদম্ব (৮)

গুরুপাদপদ্মে ভক্তি নামে সে করায়।
তত্ত্বৎ জ্ঞান শ্রীবিষ্ণুর পদে সে জন্মায়।
জন্ম মৃত্যুজরাব্যাধি দুঃখ বিমোচন।
দুর্ব্বাসনা ভ্রান্তি বীজ করয়ে খণ্ডন॥
এইরূপ করে নাম গ্রহণ করিলে।
অন্তে কৃষ্ণপদ গতি নাহি চলাচলে॥
যথা॥

বিষ্ণোর্নামৈব পুংসঃ শমনমপহরৎ পুণ্যমুৎপাদয়চ্চ ব্রহ্মাদিস্থান ভোগাদ্বিরতিমথ গুরোঃ শ্রীপদ দ্বন্দ ভক্তিং। তত্ত্বাৎজ্ঞানঞ্চ বিষ্ণোরিহমৃতি জননং ভ্রান্তি বীজঞ্চ দগ্ধা সম্পূর্ণানন্দ বোধে মহতি চ পুরুষে স্থাপয়িত্বা নিবৃত্তং॥ শ্রীধরস্বামিপাদানাং॥ আকৃষ্টিঃ কৃত চেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চংহসামাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মোক্ষঃ শ্রিয়ঃ। নোদীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং নচ পুরশ্চর্য্যা মনাগীক্ষতে মন্ত্রোহয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥ ০॥

বর্ণমাত্র কৃষ্ণনাম করিলে গ্রহণ।
পাপ তাপ বিমোচন ভক্তি বিবর্দ্ধন॥
প্রথমান্ত দ্বিতীয়ান্ত কিম্বা সম্বোধন।
লইলে কৃষ্ণের নাম অভীষ্ট পূরণ॥
প্রথমান্ত নাম ফল শুন ভাগবতে
শুকদেব গোসাঞি কন রাজা পরীক্ষিতে॥
ষষ্ঠে অজামিলোপাখ্যানে॥

হরিরিত্যবশো জল্পন্ পুমান্নার্হতি যাতনা ইতি।
তত্রচ
হরির্হরতি পাপানি দুষ্ট চিত্তৈরপিস্মৃতঃ॥
দ্বিতীয়ান্ত নাম যথা॥ ব্রহ্মপুরাণে॥
অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দ্দনং ইত্যাদিঃ॥
বিষ্ণু রহস্যে॥
হে জিহ্বে মম নিস্নেহে হরিং কিং তন্নাভাষসে ইত্যাদিঃ॥
তৃতীয়ান্ত নাম যথা।
বঞ্চিতোহং মহারাজন্ হরিনাবন্ধুরূপিনা ইত্যাদিঃ॥
চতুর্থ্যন্ত নাম যথা।
কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো-নমঃ॥
পঞ্চম্যন্ত নাম যথা।
কৃষ্ণাদন্যং কোবা দয়ালুং শরণং ব্রজামি ইতি॥
ষষ্ঠ্যন্ত নাম যথা।
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং ইত্যাদিঃ॥
সপ্তম্যন্ত নাম যথা॥
যস্তভক্তির্ভগবতি হরৌ নিশ্রেয়সেশ্বরে। ইত্যাদিঃ॥

যথা বা।

মতির্ভবতু গোবিন্দে ত্বয়ি জন্মনি জন্মনি ইতি॥

সম্বোধন নাম যথা॥

হরেমুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ॥

হে কৃষ্ণ হে বিষ্ণো হে হরে হে রাম ইত্যাদি সম্বোধন পদং॥

বর্ণ মাত্র কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ হৈলে।
কৃতার্থ সকল লোক সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥
প্রথমান্ত নাম সাক্ষাৎ অসাক্ষাতে হয়।
সাক্ষাৎকারে হয় সম্বোধনের বিষয়॥

যথা॥

বোদ্ধাস্যাভিমুখীকরণ সাক্ষাৎকারণো-পাদানং সম্বোধনমিতি॥

সাকাঙ্ক্ষে সম্বোধন সাক্ষাৎ প্রয়োগ।
আহ্বান করিয়ে সম্বোধন অনুযোগ॥
তাহা কহে শ্রীনারদ ব্যাসদেব প্রতি।
কৃষ্ণলীলা নাম গাই হৈঞা নিষ্টমতি॥
গায়িতে গায়িতে হরি দেন দরশন।
সাক্ষাত আহুতপ্রায় চিত্তগত হন॥

যথা শ্রীভাগবতে শ্রীনারদঃ॥

প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যানি তীর্থপাদ প্রিয়-শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি॥ ইতি॥

সম্বোধন নাম গান কর নারদ মুনি।
আনন্দ অন্তরে জানি দিবস রজনী॥

যথা॥

রামনারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন॥

সর্ব্ব অবতার নাম মহাফল কন।
তথাপি বিশেষ ফল করহ শ্রবণ॥
হরি কৃষ্ণ রাম এই একত্রে স্মরণ।
সহস্র অশ্বমেধ নহে তাহার সম॥

যথা বৃহদ্বশিষ্ঠ সংহিতায়াং॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রামেতি হরীত্যুক্ত্বা ততঃ-পরং।
রাজসূয় সহস্রাণাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ॥

রাজসূয়াদিক ফল প্রবর্ত্ত কারণ।
মুখ্য ফল কৃষ্ণে রতি পুরুষার্থ সাধন॥
অতএব মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তিন নাম প্রকাশিঞা জগৎ কৈল ধন্য॥
নন্দসুত শ্রীচৈতন্য হৈলা অবতার।
বলরাম নিত্যানন্দ অগ্রজ যাহার॥
পূর্ব্বদাস সখা গুরু বর্গ প্রিয়াগণ।
সাঙ্গোপাঙ্গে কলিযুগে অবতার হন॥
পঞ্চরসের ভক্তগণ সঙ্গেত লইঞা।
হরিনাম প্রচারিলা জীবের লাগিঞা॥
সম্বোধন হরিনাম করিলা প্রচার।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অগ্নি পুরাণ শ্লোক আর॥

যথা ব্রহ্মাণ্ড পুরাণং॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
ইতি জপ্ত্বা প্রমুচ্যেত পাতকী নাত্র সংশয়ঃ॥

অগ্নি পুরাণে যথা॥

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

শ্বপচোপি জপন্নিত্যং মুচ্যতে শৃণু ভার্গব॥
পুরাণ দুইয়ের শ্লোক একত্রে গাঁথিঞা॥
হরিনাম প্রচারিলা জীবের লাগিঞা॥
হরি কৃষ্ণ রাম এই নামের অর্থ শুন।
সদাশিব সম্বাদ তায় করহ শ্রবণ॥
শিব কহে শুন প্রভু অহে সনাতন।
তব নাম কীর্ত্তনে কৃতার্থ সর্ব্বজন॥
তব নাম গানে আমি জগতে প্রধান।
সগন সহিতে পূত কহি বিদ্যমান॥
সর্ব্ব জীবের পাপ তোমার নামে হরে।
অতএব ত্রিজগতে তব নাম করে॥
সর্ব্ব জীবের পাপ তাপ দুঃখ দূরে করি।
জগতে তোমার নাম হৈল শ্রীহরি॥
সকলের মন কিবা করহ হরণ।
এই হেতু হরি বলি ত্রিজগতে কন॥
যথা পাদ্মে॥
তন্নাম কীর্ত্তনাদ্বিষ্ণো পূতঃ পূজ্যোজনৈরহং
ত্বং হংসি সর্ব্বজন্তুনাং মনঃ তেন হরিঃ স্মৃতঃ॥
অন্যত্রচ॥
সর্ব্বেষাং জঙ্গমাদীনাং দেবাদীনাং
বিশেষতঃ হরত্যসৌ মনোনিত্যং স্ততো হরিরিতি স্মৃতঃ॥
পঞ্চ শ্লোকে হরিনাম করহ শ্রবণ।
ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাত যাহাতে সে হন॥
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপ অবিদ্যা হরণ।
অজ্ঞান মায়া কর্ম্ম যাহাতে খণ্ডন॥
অবিদ্যা অবিদ্যার কর্ম্ম যাইতে সে হরে।
পূর্ণব্রহ্ম ভগবান হরি বলি তারে॥
যথা॥
বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্‌ঘানানন্দ বিগ্রহং।
হরত্যহবিদ্যাং তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ॥
রাম নামের অর্থ শুন কহে তন্ত্রসারে।
রাম নামে পূর্ণ ব্রহ্ম কহেন বিচারে॥
রমণ করয়ে আত্মারামগণ যাতে।
সত্যানন্দ চিন্ময়াত্মা সেই অনন্ততে॥
এই হেতু রামনাম পরংব্রহ্ম হন।
তারকব্রহ্ম বলি রামনামে কন॥
যথা তন্ত্রে॥
রমন্তে যোগিনোনন্তে সত্যানন্দে পরাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে।
চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ফল শ্রীবিষ্ণু স্মরণে।
তাদৃক সহস্র নাম ফল হয় রাম নামে॥
যথা পাদ্মে॥
বিষ্ণোরেকৈক নামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতং।
তাদৃঙ্‌নাম সহস্রেন শ্রীরাম নাম সম্মতং॥
তত্রচ॥
রাম রামেতি রামেতি রামরামে মনোরমে।
সহস্র নামভিস্তুল্যং রাম নাম বরাননে॥
ফলং যথা অন্যত্র॥
রাকারোচ্চারণাদেব বহির্গচ্ছন্তি পাতকাঃ।
পুনঃ প্রবেশ কালে তু মকারস্তু কবাটকং॥

পুনরপি কহি শুন ব্যাখ্যান্তর করি।
রমন্ত্রীড়ায়াং ঘনন্ত সাধন তাহারি॥
গোপ গোপী লঞা কৃষ্ণ করয়ে রমণ।
রাম শব্দে কহি কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
কোন ভক্ত কহে রাম রোহিণী তনয়।
রামেতি লোকরমণাৎ ভাগবতে কয়॥
যথা দশমে॥
রামেতি লোক রমনাদ্বলভদ্রং
বলোচ্ছ্রয়াৎ ইতি॥
পুন কহি মর্ম্ম-ব্যাখ্যা অর্থান্তর করি।
ঐছে ব্যাখ্যা তন্ত্র মতে কহিল বিচারি॥
রাকারে কহি যে রাধা মকারে কৃষ্ণ রাম।
তিনরূপে পূর্ণ করে ব্রজ মনস্কাম॥
অতএব হরিনাম ব্রজ উপাসনা।
পুনঃকৃষ্ণ নাম ব্যাখ্যা শুন সর্ব্বজনা॥
কৃবাচক কৃষি শব্দ নিবৃতি ণকার।
নিবৃতি কহিয়ে নিত্যানন্দ সুখ যার॥
দুই ঐক্য পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবান।
সাকার পরমানন্দ শ্রীকৃষ্ণ আখ্যান॥
সেই কৃষ্ণনাম সর্ব্বনামের মুখ্যতর।
পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান জিহোঁ সর্ব্বেশ্বর॥
যথা॥
কৃষি র্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নিবৃতি বাচকঃ।
তয়োরক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥
বৃহদ্গৌতমীয়ে॥
কৃষি শব্দোহি সত্বার্থোণশ্চানন্দ স্বরূপকঃ।
সত্বানন্দয়োর্যোগাৎ চিৎপরং ব্রহ্ম-চোচ্যতে॥

অস্যার্থঃ॥
ভবন্ত্যস্মাৎ সর্ব্বেহর্থা ইতি কৃঃধাত্বর্থ সত্বে বোচ্যতে নিবৃতিরানন্দ স্তয়োরৈক্যং—
সামান্যাভি করণ্যেণ ব্যক্তং। যৎপরমং ব্রহ্ম সর্ব্বতোহি বৃহত্তমং সর্ব্বস্যাপি বৃংহনং বস্ত তৎকৃষ্ণ ইত্যভি ধীয়তে।
কিন্তু কৃষেরাকর্ষ প্রাচুর্য্যার্থঃ॥
ব্রহ্ম শব্দস্য তত্তদর্থঞ্চ বিষ্ণু পুরাণে।
বৃহত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ অতঃ সর্ব্বাকর্ষণ শক্তি বিশিষ্ট আনন্দঃ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ।
যস্মাদেবং সর্ব্বাকর্ষক সুখ রূপো হসৌ-তস্মাদাত্মাজীবশ্চ তত্র সুখরূপো ভবেৎ তত্র হেতুঃ ভাব প্রেমাতন্ময়া নন্দত্বাদিতি শ্রীমদ্গোস্বামিনা ব্যাখ্যাতং॥
আনন্দ সুখের কর্ত্তা গোকুল মণ্ডলে।
গোকুলানন্দ কৃষ্ণানন্দ স্মৃতে বলে॥
পঞ্চশ্লোকী যথা
আনন্দৈকসুখস্বামীশ্যামঃকমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥
সর্ব্বনাম মধ্যে কৃষ্ণনাম শ্রেষ্ঠ জানি।
প্রভাস পুরাণে দেখ ভক্তি গ্রন্থে শুনি॥
বিষ্ণুর সহস্র নাম ত্রিবার পঠনে।
সেই ফল কৃষ্ণ নাম একদা স্মরণে॥
যথা॥
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥ ইতি।

হরিকৃষ্ণ রাম এই নাম মন্ত্র সার।
কলিযুগে মহাপ্রভু করিলা প্রচার॥
কালাকাল নিয়ম নাঞি এ নাম জপিতে।
জাইথে থাকিতে পথে ভক্ষণ কালেতে॥
সর্ব্বকাল সর্ব্বদেশে করিবে কীর্ত্তন।
কৃষ্ণনাম লইতে নাঞি কালাকাল নিয়ম॥
বৃহন্নারদীয়ে।
ব্রজন্, তিষ্ঠন্ স্বসন্ অশ্নন্ স্বপন্ বাক্য প্রপূরণে।
নাম সংকীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলি-বর্দ্ধনং॥
উক্তা স্বরে শতাং যান্তি ভক্তি যুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ভক্তগণ।
মধুরাশ্রিত ভক্তাদি সভার সাধন॥
অতএব মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
সর্ব্বভক্তে হরিনাম কৈলা বিতরণ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি আপে অবনিতে।
জপি জপাইল নাম এই ত জগতে॥
সর্ব্বভক্তের অধিকার এই হরিনামে।
নিষ্ঠা হৈলে প্রাপ্তি হয় সাধনানুক্রমে॥
দাস্য বশ ভক্ত যত জপি হরিনাম।
রসাণাদি দাস সঙ্গে প্রাপ্তি ব্রজধাম॥
সখ্য ভক্ত জপি নাম সখা অনুগতে।
রামকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় ব্রজের সহিতে॥
বৎসল রসের ভক্ত সাধনানুসারে।
নন্দ সুত প্রাপ্তি তার হয় নন্দী ঘরে॥
মধুর রসের ভক্ত ও নাম জপিঞা।
রাধাকৃষ্ণ পদ প্রাপ্তি গোপী সঙ্গ পাঞা॥
বাসুদেব ভক্তগণও নাম জপিতে।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ প্রাপ্তি মহিষী সহিতে।
বাসনানুসারে সিদ্ধি হয় কৃষ্ণ নামে।
রাগানুগাগণের হয় প্রাপ্তি বৃন্দাবনে॥
সকাম ভক্তের হয় বাঞ্ছিত কামনা।
ধর্ম্ম অর্থ স্বর্গ ভোগ যে করে বাসনা॥
কৃষ্ণ নামে সর্ব্ব সিদ্ধি নাম চিন্তামণি।
নাম নামী অভেদ পুরাণে এই শুনি॥
কৃষ্ণ হন পরং ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্ম নাম।
অতএব নাম নামি দুইত প্রধান॥
পাদ্মে॥
নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নাত্মানাম নামিনোঃ।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে তৈছে হন।
কারু পুত্র কারু মিত্র পতি প্রিয়জন॥
তাহা দেখ ভাগবতে মল্ল যুদ্ধ কালে।
যার যেন মতি তৈছে দেখে রঙ্গস্থলে॥
মল্লগণ দেখে কৃষ্ণের বজ্রসম জানি।
নরলোক দেখে যেন নরশ্রেষ্ঠ মানি॥
স্ত্রীগণ দেখয়ে যেন কন্দর্প মূর্ত্তিমান।
সভার রমণিগণ দেখি মূর্চ্ছাপান॥
গোপগণ দেখে কৃষ্ণ সেই সখাবর।
দুষ্টগণ দেখি ভয় ভাবিত অন্তর॥
রাজাগণ দেখে যেন সভারি শাসন।
আমা সভার দণ্ডকর্ত্তা গোপবেশ হন॥
বসুদেব দৈবকি মানে শিশু দুইজন।
না করিল হেনপুত্র লালন পালন॥
মৃত্যুতুল্য দেখে কংস রঙ্গ স্থল হরি।
যমরাজ হেন দেখে যেন দণ্ডধারী।
তত্ত্বজ্ঞানী ভক্ত দেখে পর তত্ত্বজ্ঞান।

বৃষ্ণিগণ দেখে পরম দেবতা সমান ॥
যার যেন মতি তার কাছে তৈছে হন।
ভক্তে বাৎসল্য ভাব অভক্তে দমন ॥
অতএব হরি নাম চিন্তামণি সম।
যে যে রূপে ভজে তারে তেমন হন ॥
শ্রীদশমে শ্রীকৃষ্ণস্যনানারূপত্বদর্শনং যথা।
মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগীনাং।
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥
ধ্যান যজ্ঞ অর্চ্চন বিধি ছিল যুগান্তরে।
কলিযুগে নাম বিনু নাহিক নিস্তারে ॥
প্রসঙ্গ পাইঞা ইথে করিল বর্ণন।
নাম অপরাধ মধ্যে হরি নাম কথন ॥
সাধন ভক্তির মধ্যে বৈধীর সাধনে।
চতুঃষষ্ঠি ভক্তি অঙ্গ লিখিলাম ক্রমে ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীরূপের চরণ।
অভিরাম সুন্দরানন্দ করিঞা স্মরণ ॥
শ্রীপর্ণিগোপাল পদে করি অভিলাষ।
এ দাস নয়নানন্দ করিলা প্রকাশ ॥
কৃষ্ণভক্তি-রসকদম্ব যে করে শ্রবণ।
সে জন অচলা ভক্তি প্রায় প্রেমধন ॥
ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তি রস কদম্বে
ষষ্ঠ প্রকরণং ॥

সপ্তম প্রকরণ।

শ্রীরামকৃষ্ণঃ।
গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোগোপাল
গণাবৃতং।
রামেণ জলদশ্যামং শ্রীসুদামসখং ভজে ॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ স্বগণ সহিতে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জয় জয়াদ্বৈতে ॥
স্বগণ সহিতে শ্রীগৌরাঙ্গ বিশ্বম্ভর।
গোপাল মহান্ত জয় বৈষ্ণব ঠাকুর ॥
শুন শুন বন্ধুগণ করিয়ে বিনয়।
রাগানুগা সাধনের শুনহ নির্ণয় ॥
যাহার সাধনে ব্রজলোক হয় গতি।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থেত প্রস্তুতি।
সাধন ভক্তি দুইরূপ বৈধী রাগ ভেদে।
বৈধীভক্তির সূত্র কহিলাম আগে ॥
এবে কহি রাগাঙ্গ ভক্তি সাধনের ক্রম।
বৈধী আদি করি যত কেহ নহে সম ॥
রাগ বস্ত থাকে যাথে সেই রাগাত্মিকা ॥
রাগাত্মিকা নিষ্ঠা ব্রজে গোপ গোপিকা ॥
দাস দাসী সখাগুরু প্রেয়সীর গণে
বিরাজমান রাগাত্মিকা ব্রজবাসী জনে।
ব্রজবাসী অনুগত যে করে সাধন।
রাগানুগা বলিঞা তাঁহার নাম হন ॥
যথা শ্রীমতঃ
বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসী জনাদিষু।
রাগাত্মিকা মনুসৃতা যা সা রাগানু-
গোচ্যতে ॥
অনুসৃতা অনুগতা ইত্যর্থঃ।
রাগানুগার বিজ্ঞানার্থে করহ শ্রবণ।
আগে কহি শুন রাগাত্মিকার লক্ষণ ॥

স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে স্বাভাবিকী আবেশ।
পরম আবিষ্ট তৃষ্ণা প্রেমময় শেষ॥
স্নেহ ক্রমে স্ব স্বভাবে প্রেমতৃষ্ণা যেই।
রাগ বস্তু কহিলাম কৃষ্ণ বিষয় সেই।
রাগপ্রেরিতা ভক্তি সদা আছে যাতে।
রাগাত্মিকা শব্দে কহিলাম তাথে॥

যথা তত্র।

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা তবেদ্ভক্তি সাত্র রাগাত্মিকোদিতা॥

অস্য ব্যাখ্যা। ইষ্টে স্বানুকূল্যবিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা। তদ্ধেতু প্রেমময়ী তৃষ্ণা সা রাগো ভবেৎ তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তিঃ মধুঘৃতমিতিবৎ তন্ময়ীতদেক প্রেরিতা ইতি॥

সেই রাগাত্মিকা ভেদ পুন দুই হন।
কামরূপা সম্বন্ধরূপা এই বিবরণ॥
কৃষ্ণাবেশ মতি তাহে দেখি বহু মত।
কামদ্বেষ ভয় স্নেহ আদি হেতু কত॥
কোনরূপে কৃষ্ণ মতি যার সদা রয়।
তাহার অবশ্য অন্তে বিষ্ণুগতি হয়॥

শ্রীভাগবত সপ্তমে।

কামদ্বেষাদ্ভয়াদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্যথাভক্ত্যশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বারহরস্তদগতিং গতা।

কামরূপ তৃষ্ণায় পাইলা গোপীগণ।
ভয় হেতু মতি কৃষ্ণে সদা কংসের হন॥
শিশুপাল আদি দ্বেষ সদা কৃষ্ণে করি।
তাহারা হইল মুক্ত দেখহ বিচারি॥
সম্বন্ধে বৃষ্ণি বংশ যদুগণ যত।
স্নেহে রাজা যুধিষ্ঠির ভীম আদি কত॥
নারদাদি মুনিগণ বিধিভক্তি করি।
এইরূপে বিষ্ণুগতি বহুবিধ ধরি॥
কোনরূপে কৃষ্ণে মতি আবেশ হইলে।
তার বিষ্ণুগতি হয় শুন অন্তকালে॥

শ্রীভাগবতে

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ো য়ূয়ং স্নেহাদ্ভক্ত্যাবয়ং বিভো॥

সাধারণে কহিলাম সভার বিষ্ণুগতি।
তাহাতে বিশেষ শুন শাস্ত্রে যেবা যুক্তি॥
পরমাবিষ্ট স্নেহ ক্রমে কৃষ্ণে তৃষ্ণা যার।
রাগাত্মিকা নিষ্ঠ ভক্তি বলি কহি তার॥
ঈশ্বর বলিয়া ভয় কৃষ্ণে নাহি হয়।
প্রীতে করয়ে সেবা তাকে রাগ কয়॥
কৃষ্ণে ত ঈশ্বর ভাব যাহার সাধনে।
সেই বৈধী ভক্তি আপনার হীনজ্ঞানে॥
আনুকূল্যস্নেহহীন দ্বেষ ভয় জানি।
কংস শিশুপালাদির ভক্তি নাহি মানি॥
যুধিষ্ঠিরাদির স্নেহ সম্বন্ধজাত হন।
নারদাদির ভক্তি ঈশ্বরে হন।
অতএব ইহা সভার বৈধিতে প্রবেশ।
কাম সম্বন্ধ প্রেম রাগাত্মিকা দেশ॥

যথা আনুকূল্যবিপর্য্যাসাদ্ভীতি দ্বেষৌ পরাহতৌ।
স্নেহস্য সখ্যবাচিত্বাদ্বৈধভক্ত্যনুবর্ণিতা॥

অপিচ।

ভক্ত্যা বয়মিতিব্যক্তং বেধীভক্তিরুদী-
রিতা ইতি ॥

কৃষ্ণে মতি আবেশ হইলে কৃষ্ণেগতি।
তাহাতে আবেশ ভেদ শুনহ যুগতি ॥
কৃষ্ণে আবিষ্টতা তার তটস্থ লক্ষণ।
প্রেমময় গাঢ়তৃষ্ণা স্বরূপ কথন ॥
ভয়ে কৃষ্ণে সদা মতি কারু অরি জ্ঞানে।
বিষ্ণুময় কংস দেখে শয়ন স্বপনে ॥
কংস শিশুপাল আদির ভয়েতে আবেশ।
অতএব তাহা সভার ব্রহ্ম পরবেশ ॥
সামান্য শ্রীবিষ্ণুগতি সভার কহিল।
কাম দ্বেষ ভয় স্নেহ আগে যে বর্ণিল ॥
তাহে বিবরণ পুন শুন গ্রন্থ মতে।
যে যেরূপ পায় কৃষ্ণ যে সব স্থানেতে।
সিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানী যোগী আর রিপুগণ।
তাহা সভার ব্রহ্মপদ হয়েত গমন ॥

যথা ব্রহ্মাণ্ডে

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তিহি।
সিদ্ধাঃ ব্রহ্ম সুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা
হতাঃ ॥ ইতি ॥

প্রিয়গণ অরিগণ যদি তারে পায়।
প্রিয় অপ্রিয় তবে কিবা ভেদ তায় ॥
হরি হত অরিগণ হয় ব্রহ্মে লয়।
প্রিয়গণ অনুকূলে পারিষদ হয় ॥
এই হেতু কৃষ্ণ প্রাপ্তি সভার কহিল।
সূর্য্য সূর্য্যকান্ত্যে যেন অবিশেষ মানিল।
শ্রীকৃষ্ণে অঙ্গের কান্তি ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় ॥
এই হেতু কৃষ্ণগতি সভাকার কয় ॥

যথা অরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেক
মিবোদিতং।
তদ্ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমা-
জুষোঃ ইতি ॥

কৃষ্ণ অঙ্গ জ্যোতি হয় ব্রহ্মনিরূপণ।
ব্রহ্ম সংহিতাদি গ্রন্থে তাহা বিবরণ ॥

যথা সংহিতায়াং

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষশেষবসুধাদি বিভূতি ভিন্নং।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষ ভূতং
গোবিন্দ আদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

অপিচ।

যস্য পাদনখজ্যোৎস্নাপরং ব্রহ্মেতি
শব্দিতং ইত্যাদি।

বিধিরূপে ভক্তি করি যোগী মুনিগণ।
যে সম্পদ পান তাহা পায় অরিগণ ॥
রাগমার্গে সেবি হরি প্রেমরূপ পাঞা।
কৃষ্ণ সেবা পায় সেই সহচর হৈঞা ॥
গোসাঞীর কারিকা সূত্র করহ শ্রবণ।
যাহাতে গোপীকা উক্তি দশমে বর্ণন।

যথা

রাগবন্ধেন কেনাপিতং ভজন্তো ব্রজন্ত্যমী।
অঙ্ঘ্রিপদ্মসুধাঃ প্রেমরূপাস্তস্য প্রিয়াজনাঃ॥
ইতি তথাহি দশমে শ্রুতয় উচুঃ।

নিভৃত মরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো
হৃদি যম্মুনয় উপাসতে তদরয়োপি যযুঃ
স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগ ভুজদণ্ড বিষাক্ত
ধিয়ো বয়মপিতে সমাঃ সমদৃশোঙ্ঘ্রি
কৃষ্ণোপনিষদি। [সরোজ সুধাঃ ॥
অহো মূঢ়ো ন জানন্তি কৃষ্ণস্য নিজ্য
বৈভবং। ইত্যাদি।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় বর্ষের বীরভূমি বাঁধাই বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ২৲ দুই টাকা। এই খণ্ডে সম্পাদকের 'ভাগবত ধর্ম্ম' ক্রমশঃ বাহির হইয়াছে। সাধক রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের গীতাবলীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও অন্যান্য অনেক সারবান প্রবন্ধ আছে।

১৭ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন—

সম্পাদকের নিকট প্রাপ্তব্য।

হিমালয় ভ্রমণ।

পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ কৃত।

যাঁহাদিগের বংশধর বলিয়া হিন্দু আমরা, এখন নিজদিগকে গৌরবান্বিত মনে করি, সেই মহাপুরুষগণের প্রাচীন কীর্ত্তিমালা ও তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ আশ্রমগুলির পরিচয় লইতে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে কি কি আছে দেখুন;—

১। ঋষি ও মহাপুরুষগণের আশ্রম ও গুহার পরিচয়;

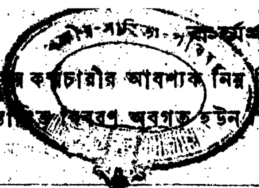
২। আশ্রমাদির দূরত্ব, পথের অবস্থা, বাসোপযোগী চটীর দূরত্ব, আহার্য্য দ্রব্যাদি ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, চড়াই উৎরাই সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ;

৩। হিমালয়বাসীর আচার, ব্যবহার, নীতি ইত্যাদি।

এইরূপ হিমালয় সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ পুস্তক ইতিপূর্ব্বে বাহির হয় নাই। কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। বীরভূমি কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়।

---

২৭৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও ১৭ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



৪র্থ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ [২য় সংখ্যা

বীরভূমি

মাসিকপত্রিকা।

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদিত।

সূচীপত্র।

মূল্য বার্ষিক ডাকমাশুল সহ ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য।০ চারি আনা। ১৭নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় প্রবন্ধ ও টাকা কড়ি সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

বীরভূমি, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস।

জীবন কথা।

সন ১৩০৩ সাল, জ্যৈষ্ঠ মাস, বৃহস্পতিবার, ঠিক তারিখ আমার স্মরণ নাই বৃহস্পতিবারের কথা স্মরণ থাকার কারণ,—প্রতি বৃহস্পতিবারে আমাদের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। সে দিন পাঠক শ্রীমৎ নীলকান্ত গোস্বামী প্রভুপাদ নীচের বৈঠক খানায়, যথায় পাঠ হয় সেখানে উপস্থিত, আর জন কয়েক শ্রোতা, যাঁহারা পাঠ শুনিতে আসেন তাঁহারাও উপস্থিত। একটী সংকীর্ত্তনের দল আমাদের বাটীতে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন। আমরা সকলে ঘর হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম—সেই সময় কলিকাতায় প্রথম প্লেগের হাঙ্গামা। প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় হরিনাম সংকীর্ত্তনের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, আমাদের পাড়াতেও চার পাঁচটী সংকীর্ত্তনের দল হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রতিদিন পাড়ায় সন্ধ্যার পর সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন, আমরা সকলেই সেইরূপ কোন একটী সংকীর্ত্তনের দল আসিয়াছে ভাবিয়াছিলাম কিন্তু প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলাম কতকগুলি বাবাজী সংকীর্ত্তন করিতেছেন। সে সময় আমার বাবাজী মহাশয়দের উপর বড়,—বড় কেন একেবারেই, কোন আস্থা ছিল না; আমার তখনকার ধারণা, যে যাহারা সংসারের অকর্ম্মণ্য, কর্ত্তব্যবিমুখ লক্ষ্যহীন, চরিত্র সম্বন্ধে একেবারেই আস্থাশূন্য এইরূপ কতকগুলি লোকে এই বাবাজীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সমাজের অনর্থক ভারস্বরূপ হইয়া লোক বঞ্চনা করিয়া আপনাদের সংকীর্ণ হৃদয়ের আশা চরিতার্থ করিয়া বেড়ান। আমার তখন এই অবস্থা, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর কিন্তু ঠিক আমার বিপরীত। তাঁহার সাধু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে প্রগাঢ় ভক্তি; আমরা জাতিতে সুবর্ণ বণিক অতএব বংশানুক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী।

শ্রীমান্ নিত্যানন্দ প্রভুর অহেতুকি কৃপা প্রভাবে বঙ্গদেশে সুবর্ণ বণিক মাত্রেই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, আমরা শ্রীমান্ নিত্যানন্দ পরিবার। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর মহাশয় সেই পরিবারভুক্তের প্রকৃত কর্ত্তব্যাদি পালনপরায়ণ ও অকুণ্ঠিত ভাবে নিজের অবস্থার অতিরিক্ত মাত্রায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সেবায় অনুরক্ত, আমার কিন্তু তাহা বড় ভাল লাগে না। আমি মনে করি দাদা মহাশয়ের এটা একটা বাতিক আর মূর্খতা, বিশেষতঃ বাবাজীদের পিছনে টাকা খরচ করাটার ন্যায় অপব্যয় আর নাই, ইহা অপেক্ষা যাহাদের প্রকৃত অভাব, পতিপুত্রহীনা অসহায়া বিধবার সাহায্য, পিতৃহীন নিঃসহায়ের উপায় না করিয়া যাঁহারা বেশ সবল, সুস্থকায়, আত্মসুখরত বাবাজীদের সাহায্য করেন তাঁহারা যে তাঁহাদের অর্থগুলা অপব্যয় করেন তাহাতেও আর সন্দেহ নাই, অপিচ তাঁহারা মানব সমাজের একটী মহানর্থের সহায়তা করেন। আমার ত তখন এইরূপ অবস্থা ; ইহা যে কতকটা ইংরাজি শিক্ষার বিষময় ফল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; একে যৌবনের মদগর্ব্ব, তাহাতে ইংরাজির গরম মসলা, উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে এই সংস্কার ও ধারণা গুলি হৃদয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু সেই ভিখারীর দল, সে দিন আমার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিল, সকল অহঙ্কার চূর্ণ করিল। তাঁহারা নাম করিতেছিলেন "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম—হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নামের কোন অর্থ বুঝিলাম না, কিন্তু কেমন যেন ভাল লাগিতে লাগিল, শুনিতে কষ্ট হইল না। ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণব বা বাবাজী মহাশয়দের গানে আমার গায়ে যেন শেল বিদ্ধ হইত কিন্তু কেন জানি না সেদিনের সেই ভিখারি বেশধারী বাবাজীগুলির ঐ "নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নামে প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা অস্পষ্ট সুখ বোধ হইতে লাগিল ; আর তাহাদের নৃত্য জানিনা—সে কি নৃত্য—আমি এতাবত চিরদিন বাবাজী মহাশয়দের নৃত্যে কখন আনন্দ লাভ করি নাই, তবে যে কারণে আমরা শাখামৃগের নৃত্য দেখিয়া থাকি, অনেক সময় হৃদয়ের সেই আশা চরিতার্থ করিবার জন্য ইহাদের উদ্দণ্ড নৃত্য দেখিতাম ; স্বইচ্ছায় যে কখন এরূপ অপকর্ম্ম করিয়াছি তাহা বোধ হয় না, যাহা দেখিয়াছি তাহাও অপরিহার্য্য অবস্থায়। কিন্তু আজি ইহাঁদের নৃত্য আমায় যেন কেমন একটা মোহে আবৃত করিতে লাগিল। আমি অবাক ও স্তম্ভিত হইয়া দেখিতেছি পাঁচ ছয় জন ব্যক্তি মণ্ডলা কারে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মধ্যে এক জনকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন।

মধ্যের যিনি, দেখিয়া বোধ হইল, তিনিই এই সংকীর্ত্তনদলের নায়ক—কারণ তিনি গাহিতেছেন আর সকলে তাঁহার দোহারকি করিতেছেন—এই মধ্যের যিনি তিনি একবার গাহিতেছেন, তার পর সঙ্গীগণ সেই পদটী যখন গাহিতেছেন, তখন মধ্যের যিনি তিনি নৃত্য করিতেছেন আর সঙ্গিগণও মণ্ডলাকারে তাঁহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছেন। সে নৃত্যের কি মাধুরী। বিশেষতঃ যিনি মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। আমি অনেক নৃত্য দেখিয়াছি; কলিকাতা মহানগরীতে এমন কোন নর্ত্তক বা নর্ত্তকী নাই, (অবশ্য খ্যাতনামাদের মধ্যে) যাঁহার নৃত্য আমি দেখি নাই। ইহা ছাড়া, কাশী, দিল্লী, অমৃতসর সহর প্রভৃতি অনেক স্থানে অনেক সুবিখ্যাত নর্ত্তক ও নর্ত্তকীর নৃত্য আমি দেখিয়াছি। কিন্তু এ কি নৃত্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! অবশ্য সমালোচকের দৃষ্টিতে নৃত্যের বিজ্ঞান খুলিয়া যদি এ নৃত্যের কেহ বিশ্লেষণ করিতে বসেন তাহা হইলে তিনি হয়ত ইহার কোন গুণই দেখিতে পাইবেন না, ইহাকে শেষে নৃত্য বলিতেই তিনি কুণ্ঠিত হইবেন ও ইহা একটী লাফালাফি মাত্র বলিবেন, কিন্তু আমি খুব দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, যে কেহ এই মহাত্মার নৃত্য একবার দেখিয়াছেন তিনি জীবনে কখন তাহা ভুলিবেন না; সে নৃত্য যেন কথা কয়, যেন একটা কি অব্যক্ত—যাহা ভাষায় ব্যক্ত হয় না, সঙ্গীতে বুঝান যায় না, যে ভাব শব্দে উচ্চারিত হয় না এ নৃত্য যেন সেই কথা, সেই ভাব ব্যক্ত করে। সে ভাবটী, সে কথাটি আবার এ রাজ্যের নয়। তাহা এ রাজ্য ভুলাইয়া আমাদের যেন এক সুদূর শান্তি রাজ্যের চন্দ্রমাশালিনী মধুযামিনী ও মনোমুগ্ধকর নিকুঞ্জের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যেন আমাদের এ ত্রিতাপজড়িত প্রবাসে স্বদেশের কথা আনিয়া দেয়। প্রায় একঘণ্টাকাল এই আগন্তুক সংকীর্ত্তনকারীগণ সংকীর্ত্তন করিলেন। আমরা কেহই তাঁহাদের জানি না; সংকীর্ত্তন সমাধার পর আমরা তাঁহাদের গৃহে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিলাম। তাঁহারা সকলে আসিয়া আমাদের বৈঠকখানায় বসিলেন। আমরাও সকলে বসিলাম। প্রভুপাদ নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়, আগন্তুক দিগের মধ্যে যিনি নায়কস্বরূপ হইয়া সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সদালাপ করিতে লাগিলেন। প্রভুপাদ প্রথমেই আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে সম্বোধন করিয়া আর সংকীর্ত্তনদলের নায়ককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন * * * * "তুমি বৈষ্ণব বৈষ্ণব করিয়া বড় ব্যাকুল হও, এই আজ একটী প্রকৃত বৈষ্ণব পাইয়াছ সযত্নে ইহার সেবা কর।" আর তাঁহাকে বলিলেন

"আপনি + + + + কে কৃপা করিবেন ও বড় ভাল ছেলে"। তাহার পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোথায় থাকা হয়"। তিনি উত্তর করিলেন "আমাদের থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। আমরা ভিখারী। তবে অধিক সময় শ্রীধাম পুরীতে থাকি।"

প্রভুপাদ। আপনার নাম?

আগন্তুক। এ দাসকে লোকে রাধারমণ চরণ দাস বলিয়া ডাকে।

প্রভুপাদ। (তাঁহার সঙ্গীগণকে লক্ষ্য করিয়া) ইহারা কি আপনার সঙ্গেই থাকেন?

রাধা। আপাততঃ আছেন।

প্রভু। শ্রীধাম পুরীতে কোথায় থাকা হয়।

রাধা। আমরা ভিখারী, থাকার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই।

তাহার পর প্রভুপাদ নীলকান্ত গোস্বামীর পাঠ আরম্ভ হইল। পাঠের পর সেদিন শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় আমাদের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন।

তিনি যে কোন কথা কহিতে লাগিলেন আমার তাহা বড় ভাল লাগিতে লাগিল। তাঁহার কথা গুলিতে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতার ছায়া বা সংকীর্ণতার সংস্পর্শ নাই, সকল কথা গুলি সরল সুযুক্তিপূর্ণ আর প্রত্যেক কথাটীতে, প্রত্যেক যুক্তিতে, প্রতি তত্ত্বনির্ণয়ে যেন একটা কি মধুর ভাব, সেটা বোধ হয় প্রেমের কথায়, ভক্তির মাধুরী। সে দিন অন্যান্য কথার প্রসঙ্গে শ্রীধাম পুরীর শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের কথা উঠিল। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপনাপন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কেহ পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের গবেষণা অনুসারে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তিটী বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিপন্ন করিলেন, কেহ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আনীত বলিয়া শ্রীজগন্নাথ মঙ্গল গ্রন্থের ইতিহাস বিবৃত করিলেন, কেহ বা আবার অন্য অনেক কথা বলিলেন। সকলের কথার পর শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করা হইল "আপনার কি মত বলুন।" তিনি "বলিলেন আপনারা যে যাহা বলিলেন এ সকলগুলি সত্য মত।"

এই কথা শুনিয়া এক জন বলিয়া উঠিলেন "সে কি মহাশয়, সকলগুলি কখন সত্য হইতে পারে। ইহা যে অসম্ভব।"

বাবাজী। আজ্ঞে, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাও সত্য; আমাদের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একে অসম্ভব কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে সকলি সম্ভবপর।

আপনারা শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেব সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিলেন সে গুলি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হইলেও তাঁহাতে সকলি সম্ভব।

একজন বলিলেন "আচ্ছা মহাশয়, জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তিটী ওরূপ হস্তপদ-বিহীন, বিস্তারিত নেত্র একটী হত-গজ রকম হইবার কারণ কি। এ ভগবানের কোন্ রূপ?"

বাবাজী। শ্রীজগন্নাথ মঙ্গল গ্রন্থে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের বিস্তারিত বিবরণ আছে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন যে রূপে নীলমাধব মূর্ত্তি ব্যাধের নিকট হইতে আনয়ন করেন তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, আর ইতিপূর্ব্বে তাহা একজন ভক্ত কর্ত্তৃক বিবৃতও হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তিটী হস্তপদহীন হইবার কোন বিশেষ কারণ দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে আমি একজন মহাপুরুষের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহাতে যদি আপনাদের কথঞ্চিৎ কৌতুহল নিবৃত্তি হয়, বলি শুনুন—শ্রীবৃন্দাবন লীলার অবসানে শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় অবস্থিত থাকিয়া দ্বারকালীলা করিতেছেন, সেই সময় দ্বারকার মহিষীরা সকলে এক দিবস একত্র হইয়া কথোপকথন করিতে করিতে একজন বলিলেন "ভাই, ঠাকুর বৃন্দাবনলীলায় না জানি কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন; কারণ তাহা না হইলে এখন পর্য্যন্ত এই দ্বারকাধামের সুখসম্পদ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি কেন সেই দীন হীন গ্রাম্য গোপ গোপীর কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না। তোমরা সকলেই বোধ হয় জান যে ঠাকুর প্রায় নিশীথে নিদ্রা যাইতে যাইতে রাধা রাধা বলিয়া কাঁদিয়া উঠেন।" এই কথা শুনিয়া মহিষীরা সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন "হ্যাঁ ভাই! তুমি অতি সত্য কথা বলিয়াছ। ঠাকুর সত্য সত্যই প্রায় প্রতি নিশীথেই নিদ্রাবস্থায় রাধা রাধা বলিয়া কাঁদেন।" এই বিষয় লইয়া আলোচনা হইতে হইতে মহিষীরা সকলে স্থির করিলেন যে "ঠাকুরের বৃন্দাবন লীলার কাহিনীটী আমাদের আমূল শ্রবণকরা উচিত, তাহা না হইলে আমরা ঠাকুরের বৃন্দাবনের সেই দীন হীন গোপ গোপীর প্রতি তাঁহার আকৃষ্টতার কারণ উপলব্ধি করিতে পারিব না।" ইহা স্থির হইলে তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন যে শ্রীদ্বারকাধামে শ্রীবৃন্দাবন লীলার সমস্ত কাহিনী জ্ঞাত আছেন এরূপ কেহ আছেন কি না। ক্রমে স্থির হইল একমাত্র রোহিণী মাতা ভিন্ন সমস্ত বৃন্দাবন লীলা পরিদর্শন করিয়াছেন শ্রীদ্বারকাধামে এরূপ আর কেহ নাই। তখন মহিষীরা সকলে রোহিণী মাতার নিকট গিয়া শ্রীবৃন্দাবন লীলার

কাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। রোহিণী মাতা বলিলেন "আমি মা হইয়া কিরূপে বলিব।" কিন্তু মহিষীরা কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। তখন মাতা বলিলেন "তোমাদের আমি সে লীলা শ্রবণ করাইতে পারি, যদি তোমরা এমন কোন নিভৃত স্থান স্থির করিতে পার যেখানে তোমরা ছাড়া আর কেহ আসিতে পারিবে না।" মহিষীরা বলিলেন "আমাদের অন্তঃপুরে ত কাহার আসিবার সম্ভাবনা নাই।" রোহিণী মাতা বলিলেন "কৃষ্ণ বলরাম ত আসিতে পারে, আর এক কথা যেখানে শ্রীবৃন্দাবন লীলাকীর্ত্তন হইবে সেখানে কৃষ্ণ বলরাম সে মধুর লীলার আকর্ষণীতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার কি উপায় করিবে।" মহিষীরা এ বিষয় মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে দেবী সুভদ্রা দ্বারী হইয়া, যতক্ষণ রোহিণী মাতা শ্রীবৃন্দাবন লীলা পরিকীর্ত্তন করিবেন ততক্ষণ দ্বার রক্ষা করিবেন, কাহাকেও আসিতে দিবেন না। এই সমস্ত স্থির হইলে দেবী সুভদ্রা দ্বারী হইয়া দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন, আর মহিষীরা রোহিণী মাতার নিকট শ্রীবৃন্দাবন লীলা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। রোহিণী মাতা প্রথমে অতি ধীরে ধীরে অনুচ্চকণ্ঠে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ লীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন, ক্রমে বর্ণনে ও শ্রবণে রোহিণী মাতা ও মহিষীবৃন্দ সকলেই আত্মহারা ও তন্ময়, তখন রোহিণী মাতার কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতম গ্রামে উঠিয়া গৃহ প্লাবিত করিয়া বহির্দ্দেশে আসিয়া সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল, দেবী সুভদ্রা তাহাতে ক্রমে আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ বলরাম আসিয়া উপস্থিত। সুভদ্রা দেবী তখন আনন্দবিহ্বলা, ভাববিভোরা আত্মবিস্মৃতা। দেবী যে কার্য্যে নিয়োজিত তাহাও যেন বিস্মৃতা। ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া সানন্দে গিয়া উভয়ের হস্ত ধারণ করিলেন। সুভদ্রা দেবীর সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় স্তম্ভিত। কিন্তু অধিক্ষণ আর স্তম্ভিত থাকিতে হইল না, রোহিণী মাতার শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ লীলা কাহিনীর অমৃতময়ী কলকণ্ঠ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলরামের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল, তাঁহারা তিনজনে—মধ্যে দেবী সুভদ্রা, বামে শ্রীকৃষ্ণ, দক্ষিণে শ্রীবলরাম—সেই দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সে মধুর লীলা শ্রবণ করিতে লাগিলেন, শ্রবণে ক্রমে আনন্দের লহরী উথলিতে লাগিল, প্রেমের কথায় প্রেমের স্রোত বহিতে লাগিল, ক্রমে তিনজনে আত্মহারা, ভাবে ভরা, আনন্দে বিগলিত, হস্ত পদ সঙ্কুচিত, নয়ন বিস্তারিত, যেন আনন্দে গলিয়া যাইতে লাগিলেন এই প্রেমে, গলা আনন্দপোরা

ভগবানের মূর্ত্তিই শ্রীধাম পুরীর শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা দেবীর মূর্ত্তি।"

এ কাহিনীটী কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নয় কিন্তু আমার বড় ভাল লাগিল। সে দিন আহারাদির পর শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গীগণ বিশ্রাম করিলেন, আমি তাঁহাদের নিকটেই রহিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া নাম সংকীর্ত্তন হইল, পরে আহারাদির বন্দোবস্তের জন্য আমি ব্যস্ত, কিন্তু মাঝে মাঝে যেমন একটু অবসর পাই আসিয়া বাবাজী মহাশয়ের নিকট বসি। অনেক লোক আসিতে লাগিলেন, তিনি সকলের সঙ্গেই আনন্দ চিত্তে সহাস্য বদনে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। কেহ কোন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে অতি সরল কথায় তাহার সদুত্তর দেন; কাহার সহিত কোন বিষয় লইয়া তর্ক করা যেন তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ; যে যাহা বলেন কিছুতেই বিরক্তি নাই যেন সন্তোষের প্রতিমূর্ত্তি।

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আমরা ভগবান পাইব কিরূপে।" শ্রীমৎ বাবাজী মহাশয় বলিলেন "তাঁহাকে চাহিলেই পাওয়া যায়।"

প্রশ্ন। ভগবানকে চাহিলেই পাওয়া যায়?

বাবাজী। নিশ্চয়, দেখুন ভগবান আপনাকে দিবার জন্য সতত ব্যস্ত কিন্তু আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে চাহিনা, চাহিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।

প্রশ্ন। আপনি কি বলেন আমরা ভগবান চাই না।

বাবাজী। না, আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকে চাই না। দেখুন, আমার কথায় বিরক্ত হইবেন না। আচ্ছা বলুন দেখি, আমরা সামান্য অর্থের জন্য এ সংসারে যত কষ্ট স্বীকার করি, একটি পুত্র কন্যা বা আত্মীয়ের রোগ হইলে যত ব্যস্ত হই, আমাদের এক একটী বাসনা কামনা পরিতৃপ্তির জন্য এ সংসারে যত একাগ্রতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া থাকি, তাহার সহস্রাংশের একাংশ ব্যাকুলতা ও একাগ্রতা কি আমাদের ভগবান প্রাপ্তির জন্য আছে? আমরা সকলেই এ সংসারে নিজের সুখের জন্যই ব্যস্ত। ভগবানও যে আমরা চাই তাহাও নিজের সুখের জন্য।

প্রশ্ন। মানব জীবনে প্রাপ্তির বস্তু সুখ ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

বাবাজী। আনন্দ, সুখ নয়।

প্রশ্ন। আনন্দ আর সুখের পার্থক্য কি?

বাবাজী। সুখ মায়া কল্পনা; আনন্দ নিত্য ও সত্য বস্তু। সুখ নিজের জন্য ব্যস্ত, এ সংসারকে আপনার করিবার জন্য ব্যগ্র; আনন্দ অপরের জন্য লালায়িত, সংসারের হইবার জন্য কাতর। সুখ প্রভু হইতে চায়; আনন্দ দাসানুদাস হইবার জন্য লালায়িত। সুখের সর্ব্বদাই ভয় পাছে কিছু হারায়; আনন্দ আপনার যথাসর্ব্বস্ব অকুণ্ঠিত ভাবে বিতরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে। সুখ সংসারের ধূলামাটি হইতে সতত সসঙ্কোচ, আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য সশঙ্কিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া সংসারের সকল বাধা, সকল বিপত্তি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া এক হইয়া যায়। সুখ সুধার জন্য লালায়িত; আনন্দ দুঃখের বিষ কণ্ঠে ধরিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া সদাশিব, সদানন্দে বসিয়া থাকে। সুখ স্বার্থ; আনন্দ নিঃস্বার্থ।

প্রশ্ন। এ আনন্দ পাইবার উপায়?

বাবাজী। ভগবৎ নাম সংকীর্ত্তনই আনন্দ ও ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

প্রশ্ন। নামসংকীর্ত্তনই ভগবৎ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়?

বাবাজী। নিশ্চয়, ইহা আমার নিজের কথা নয়, আমাদের সনাতন আর্য্য শাস্ত্র এই কথাই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন—সত্যে ধ্যান—ত্রেতায় যজ্ঞ—দ্বাপরে অর্চ্চন—কলিতে নাম সংকীর্ত্তন।

প্রশ্ন। হিন্দু শাস্ত্রে এ কথা আছে সত্য কিন্তু আমাদের অনন্ত শাস্ত্র, অনন্ত মত, নাম সংকীর্ত্তন তারি মধ্যে একটী মাত্র পথ হইতে পারে।

বাবাজী। না শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন "হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরৈর্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

প্রশ্ন। আপনি কি বলেন এক্ষণে কলিকালে যাগ, যজ্ঞ, যোগ, তপস্যা প্রভৃতিতে কোনরূপ ফল হয় না?

বাবাজী। আমি, এ কথা বলি না তবে আমাদের সনাতন শাস্ত্র এই কথা বলেন বটে। দেখুন, প্রকৃত কথা সকল পথই পথ; যিনি যে কোন পথ সরল অন্তঃকরণে ব্যাকুলতার সহিত অবলম্বন করিবেন তিনি তাহাতেই সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারিবেন। প্রকৃত ও প্রধান আবশ্যক সরলতা ও ব্যাকুলতা। তবে আবার ব্যবস্থাটী অবস্থানুরূপ হইল কি না, তাহা দেখাও একান্ত কর্ত্তব্য। যোগাদির জন্য যেরূপ দীর্ঘায়ুর প্রয়োজন এক্ষণে কলির জীব আমাদের তাহা নাই। তাহার পর এখনকার মানব সমাজ দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে,

প্রকৃতি যেরূপ সংস্কার-সম্ভূত হইলে যোগাদির কঠোর নিয়ম সংযম প্রতিপালনে মানবপ্রকৃতি সক্ষম হয় একালের অন্নগতপ্রাণ আমাদের প্রকৃতিতে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাগ যজ্ঞাদিরও কাল ও অবস্থা অনুকূল বলিয়া বোধ হয় না। যাগ যজ্ঞাদির আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদির অভাব। কালের প্রাদুর্ভাবে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরও অভাব। আমরা এক্ষণে সভ্যতোন্মুখ কলির জীব, নিরন্তর বাসনা কামনার ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রমে স্বার্থের মোহে অন্ধ হইয়া কাল কলির প্রাদুর্ভাবে কামাসক্ত ও পাপোন্মুখ হইয়া মায়াকূপে অধোমুখে নিপতিত। এখনকার উচ্চ শিক্ষার উচ্চতম প্রকাশ নাস্তিকতা হইয়া পড়িয়াছে ; এ অবস্থার ব্যবস্থা, এ রোগের ঔষধি, ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন হইতে পারে না। তাই আমাদের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানজ্ঞ পরহিতব্রত মহর্ষিবৃন্দ আমাদের জন্য আমাদের যোগের একমাত্র ঔষধি ভগবৎ নামসংকীর্ত্তন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাহাই আবার আমাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীভগবান শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনি যাজন করিয়া জীবের মুক্তির উপায় মানবের পূর্ণ পরিণতির পথ দর্শাইয়া গিয়াছেন। দেখুন আমরা যদি একবার আমাদের নিজের অবস্থা নয়ন মেলিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি আমাদের জীব আখ্যাও নয়,নিত্য কৃষ্ণদাস এই অনুভূতি ও স্থির বিশ্বাস হইলে জীব আখ্যা হয়, আমাদের কি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হইয়াছে? আমাদের প্রকৃত অবস্থা কলিতে কামাসক্ত পাপোন্মুখ, মায়াকূপে অধোমুখে নিপতিত, এই কাল ও অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলায় শ্রীমান্ নিত্যানন্দ প্রভু কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। আমার পরম দয়াল নিতাই (বলিতে বলিতে চক্ষু আরক্তিম, সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল) এই কলিহত জীবের জন্য হরিনাম মহোষধি বিধান করিয়া, সাধিয়া কাঁদিয়া মার খাইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে পায়ে ধরিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাই, নামসংকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র পরিত্রাণের উপায়।

প্রশ্ন। আপনি যদি বিরক্ত না হন, তাহা হইলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

বাবাজী। আজ্ঞা করুন, আমি কেন বিরক্ত হইব। আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা আমার সহিত সদালাপ করিতেছেন।

প্রশ্ন। নাম সংকীর্ত্তনই যদি একমাত্র পথ হয়, তাহা হইলে আমাদের শাস্ত্রের অগণ্য পথ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন উপাসনা ত কিছুই থাকে না, সে সমস্তই অলীক অপ্রকৃত ; কার্য্যকরী নয় বলিতে হয়।

বাবাজী। কেন, কিসে তাহা আপনি অনুমান করিতেছেন?

প্রশ্ন। আপনি বলিলেন "হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যের নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" কলিতে হরি নামই একমাত্র পথ অন্য পথ নাই, তাহা হইলে আমাদের শাস্ত্রানুমোদিত সৌর, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কি? কালী, তারা, শিব প্রভৃতি দেবতারই বা আবশ্যক কি? একথায় যেন বুঝায় আর সকল পথ ভ্রান্ত একমাত্র বক্তব্য পথটীই পথ। আপনি কি সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের তাহাই অভিপ্রায় বলেন?

বাবাজী: না, না, আমি তাহা বলি না বা সনাতন হিন্দু শাস্ত্রেরও তাহা অভিপ্রায় নয়। দেখুন, এই বিশ্বরচনার চতুর্দ্দিক বৈচিত্র্যময়। একটী বৃক্ষে কত লক্ষ পত্র, কিন্তু দুইটী পত্র একরূপ হয় না, আমরা কত কোটি কোটি মানব, আমাদের মধ্যে দুইটী মানব আকৃতি ও প্রকৃতিতে অবিকল একরূপ পাওয়া যায় না। এই যেমন বিশ্বসংসারের একদিকে বৈচিত্র্যময় আবার তাহার আর একদিকে একটী অপূর্ব্ব মিলন বা সামঞ্জস্য। যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে একটী পত্র খসিয়া মাটীতে পড়ে,সেই নিয়মেরই বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সমস্ত সৌরজগৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একদিকে পৃথিবীর সমস্ত মানবমণ্ডলী প্রত্যেকেই আপনাপন স্বরূপ স্বভাব লইয়া এ সংসারে কতই বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন পথে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যে আবার আর একদিকে প্রত্যেকেই এক স্থানে; এক সকলেই, প্রত্যেকেই আনন্দের জন্য প্রয়াসী, যে যাহা করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য আনন্দ। অতএব এ জগৎসংসারে দুইটি পৃথক শক্তির খেলা নিরন্তর দেখা যায়, একটী আকর্ষণ, একটি বিকর্ষণ, একটী কেন্দ্রানুগ, একটি কেন্দ্রাতীগ, একটি টান রাখা, একটী ছাড় দেওয়া, এই নিত্য লীলাতেই সমস্ত প্রকাশ প্রকাশিত। ইহার একটীর স্বধর্ম্ম—অনন্ত বৈচিত্র্যের বিকাশ, অপরটীর স্বধর্ম্ম—অনন্ত বৈচিত্র্যের উদ্দাম উল্লাসকে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে মিলাইয়া দেওয়া। অতএব যদি বিশ্বসংসারের সমস্তটা ভাল করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বৈচিত্র্যের মধ্যেই ঐক্য, দ্বৈত্যের মধ্যে এককে দেখা যায় ও বুঝা যায়। প্রকৃতির নিয়মই এই বহুর মধ্যে একের লীলা, বহু হইয়া লীলা করাই লীলাময়ের লীলা। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম, এই নিয়মের যথায় ব্যতিক্রম তাহা কখন প্রকৃত বা সত্য হইতে পারে না। আমাদের সনাতন আর্য্য শাস্ত্র, আর্য্য ধর্ম্মও

যদি সত্য ধর্ম্ম হয় তাহা হইলে তাহাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। আমাদের সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম যে প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম, ইহা যে একমাত্র মানবের পূর্ণ পরিণতির ও আধুনিক পৃথিবীর মধ্যে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইাছে তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ, তাহার একমাত্র কারণই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া এককে উপলব্ধি করান, বহুর মধ্যে একের সামঞ্জস্য। তাই আমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতা এত বিভিন্ন সম্প্রদায় কিন্তু এই সমস্তেরই উদ্দেশ্য, সেই সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করান। শাস্ত্র যেখানে বলিয়াছেন, কলিতে নামসংকীর্ত্তনই পাইবার একমাত্র উপায়, সেখানে বুঝা উচিত যে কোন সাম্প্রদায়িক নাম নহে। সত্যে ধ্যান, একথায় ইহা বুঝায় না বা আমাদের শাস্ত্রাদিতেও দেখা যায় না যে একটী মাত্র রূপের ধ্যান, বরং দেখা যায় যে, সে সময় কত শত শত বিভিন্ন দেবতার ধ্যানে মহর্ষিবৃন্দ তন্ময় হইতেন। ত্রেতায় যজ্ঞ, একথায় একটী মাত্র কোন নির্দ্দিষ্ট যজ্ঞের কথা বুঝায় না, সে সময় কত শত বিভিন্ন প্রকারের যজ্ঞাদির কথা শাস্ত্রে দেখা যায়। কলিতেও নামসংকীর্ত্তন বলিলে শুদ্ধ কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কোন নির্দ্দিষ্ট নামসংকীর্ত্তন বুঝায় না বা তাহাও তাৎপর্য্য নয়। তবে এক্ষণের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা নামসংকীর্ত্তন, ধ্যান যোগ যজ্ঞাদি নয়, ইহাই বুঝায়। সেই অনাদি অনন্ত সচ্চিদানন্দ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ অনন্ত রসেশ্বরের অনন্ত রূপ অনন্ত ঐশ্বর্য্য, অনন্ত রসকে, তাঁহারই প্রকাশ যে আমরা, সেই আমাদিগকে অনন্ত রূপে অনন্ত পথে জানিতে, পাইতে, অনুভব করিতে ও আস্বাদন করিতে হইবে, ইহাই ত প্রকৃত, তাহা না হইয়া যদি সে অনন্তকে একটী মাত্র বাঁধা পথেই পাওয়া যায় বা অনুভব করা যায়, বা বলা যায় তাহা হইলে তাহা কখনই প্রকৃত হইতে পারে না।

প্রশ্ন। আপনি যে বলিলেন "হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলং ;" হরি নামই একমাত্র উপায়।

বাবাজী। তাহাতে দোষ কি ?

প্রশ্ন। উহাত কেবল মাত্র আমাদের হিন্দুধর্ম্মের একটী সাম্প্রদায়িক নাম। বৈষ্ণবেরাই হরিবোল দেয়, হরি নাম করে, হরি সংকীর্ত্তন করে, অন্য সম্প্রদায় করে না।

বাবাজী। দেখুন, যে বৈষ্ণব তাঁহার হরিকে কেবল মাত্র আপন সম্প্রদায় ভুক্ত করেন বা ভাবেন, তিনি বৈষ্ণব বা মহাজন হইতে পারেন কিন্তু আমার নিতাইএর দাস নন। আর যে সৌর, শাক্ত বা শৈব, প্রভৃতি অন্য সাম্প্রদায়িক-

গণ হরি নাম আপনাদের সম্প্রদায় ভুক্ত বা তাঁহাদের উপাস্য নাম নয় বলেন, তাঁহারাও হরি শব্দের তাৎপর্য্য বা বুৎপত্তি যাহা আমি আমার গুরুদেবের কৃপায় বুঝিয়াছি, তাঁহারা বোধ হয় সেরূপ ভাবে বুঝেন না।

প্রশ্ন। হরি শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

বাবাজী। আমরা মানব, বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত যোনির মধ্যে মানব যোনিই শ্রেষ্ঠ, এই শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যোনিতে জীবের আহার বিহার মৈথুন ব্যতীত আর কতকগুলি বিষয়ের বিকাশ দেখা যায়। ভাব ও উপলব্ধিই সেই বিকাশ। আমরা অনাদি বর্হিমুখ জীব, আমাদের এই মানব জীবন অবিদ্যা ও অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত। অজ্ঞান ও অবিদ্যা পরাজয় না হইলে এ জীবনে ভাব ও উপলব্ধির বিকাশ হয় না, অতএব এ মানবের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য অবিদ্যা ও অজ্ঞান পরাজয়। এই অবিদ্যা ও অজ্ঞান পরাজয় করিতে হইলে বিদ্যা ও জ্ঞানের আবশ্যক,এই বিদ্যা অর্থে প্রথম ভাষা। ভাষাই মানবের প্রকাশ ! আজ যদি মানবের ভাষা না থাকিত, তাহা হইলে মানবকে মূক ও জড় সদৃশ হইতে হইত, মানবের মানবত্ব, আমাদের পরস্পরের হৃদয়ের আদান, প্রদান, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, উল্লাস, প্রেম, ভক্তি কিছুই থাকিত না, ভাবিয়া দেখ আজ আমরা যে সকল পুর্ব্ব মহাজন ভারতের মহর্ষিবৃন্দের হৃদয়ের ভাব, প্রাণের উপলব্ধি, বেদ উপনিষদে প্রাপ্ত হই, ভাষাই তাহার মূল। আজ যে শাস্ত্রের কথিত অবতার সকল নিত্য বলিয়া বুঝি বা বিশ্বাস করি তাহারও মূল ভাষা ! ভাষাতেই সেই সচ্চিদানন্দের নিত্যত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। আবার আর এক দিকে দেখ, ভাষা শব্দ মাত্র। শব্দই ভগবৎ প্রকাশের সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ। প্রথম তন্মাত্র আকাশ, আকাশের গুণ শব্দ, শব্দে কম্পন, কম্পনে বায়ুর সৃষ্টি, বায়ুর পরস্পর ঘর্ষণ ও ঘাত প্রতিঘাত অগ্নি, ক্রমে তিন ভূতের সংমিশ্রণে জল, পরে চারি ভূতের ঘাত প্রতিঘাতে মৃত্তিকা।

ভদ্র। আপনি যদি কোন অপরাধ না লন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

বাবাজী। সে কি—আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনারা আমার মত অকিঞ্চিৎকরের সঙ্গে সদালাপ করিবেন। আপনি অকপটে যা বল্‌বেন বলুন।

ভদ্র। নামের বিষয় আপনি যাহা বলিলেন সে সমস্তই শাস্ত্রসম্মত কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ এখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমি নামের অর্থ বুঝিতে চাইনা। তবে শুদ্ধমাত্র মুখে নাম করিলেই অর্থাৎ একটী শব্দ উচ্চারণ

করিলেই কি নাম করা হয়, আর তাহাতেই পরমপদ লাভ হয়? আমার মনের কথা আপনাকে বলি। আজ কাল শ্রীমান মহাপ্রভুর পথাবলম্বীরা এই নামের মহিমা খুব উচ্চ কণ্ঠে প্রচার করেন। তাঁহাদের কথার ভাব, নাম করিলেই পরমপদ লাভ হয়! কিন্তু তাই যদি হয় তাহা হইলে আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া প্রচার করেন তাঁহাদের মধ্যে এত আবর্জ্জনা কেন? শ্রীমান মহাপ্রভু আজ চারিশত কয়েক বৎসর অপ্রকট হইয়াছেন, এই অল্প সময়ের মধ্যে এই পথ যেরূপ আবর্জ্জনা-ময় হইয়াছে বোধ হয় পৃথিবীর কোন ধর্ম্ম এত শীঘ্র এরূপ হয়নি। প্রত্যক্ষ চারি ধারে দেখি যে যাঁহাদের জীবিকার উপায় হরিনাম সংকীর্ত্তন, যাঁহারা প্রতি দিন দুবেলা অহরহ নাম করিতেছেন, তাঁহাদের জীবন যাত্রার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি করিলেই দেখা যায় যে তাঁহারা অনেকেই সামান্য নীতিরও বহির্ভূত, এর কারণ কি? আমি নামে কটাক্ষ কর্‌চি না। বড় ব্যথায় আপনাকে আজ একথা জিজ্ঞাসা কর্‌চি।

বাবাজী। আপনার প্রতি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপা তাই এই প্রাণে ব্যথা। আমার বোধ হয় আপনার মনের ভাব, যে শাস্ত্র যখন বলিতেছেন যে ভগবৎ নামই পরম পদ লাভের উপায় তখন এই নাম বলিলে আমরা কি বুঝি? একটা পাখী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, একটা জড় যন্ত্র হরি নাম বলে, এইরূপ মানুষ যদি পাখীর মত বা যন্ত্রের মত নাম করে তাহাতে তাহার পরমপদ লাভ হইবে কি না অর্থাৎ বস্তু লক্ষ্য নাই, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নাই, হৃদয়ে উপলব্ধি নাই মনে ধারণা নাই অর্থাৎ প্রাণহীন মনহীন হৃদয় হীনের জ্ঞানহীনের শব্দ মাত্র উচ্চারণ কি নাম সাধন?

নিত্যানন্দ দাস।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সূচনা।

ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা করিয়া সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ভারতবাসী আর্য্যগণ খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই সভ্যতালোক প্রাপ্ত হইয়া সভ্যসমাজোচিত আচার অনুষ্ঠান করিতেন। দিন দিন ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব যত আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য ব্যবহার ইত্যাদি সভ্যজগতের বিবিধ অনুষ্ঠান অতি পুরাকালে ভারতে অনুষ্ঠিত হইত; ফলতঃ বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে পণ্ডিতগণ মস্তিষ্ক

পরিচালনা করিয়া আত্মোন্নতি সাধন করিতে যে যে উপাদান সংগ্রহ করিতেছেন, ভারতনিবাসী আর্য্যগণ সুদূর অতীত যুগে তাহার অনেক আয়োজন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক শক্তির বশে ভগবচ্চিন্তা এতদ্দেশীয়গণের হৃদয়ে সুদৃঢ় ভাবে সম্বন্ধ। পুরাকালে ইঁহাদিগের জীবনে এমন কোনও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত না, যাহা ধর্ম্মমূলে প্রতিষ্ঠিত নহে। এইজন্য মহামতি Monier Williams বলিয়াছিলেন Religion received no special name from the Hindus ; they eat religiously, they sit religiously &c. ফলতঃ ধর্ম্মপ্রাণতা ভারতবাসীর চরিত্রবৈশিষ্য।

প্রাচীন ভারতবাসিগণ আর্য্যনামে অভিহিত এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্ম আর্য্য-ধর্ম্ম। কালে সেই আর্য্যধর্ম্ম কোনও অপরিজ্ঞাত বিশেষ কারণ হইতে হিন্দু নামে পরিচিত হইয়াছে এবং তৎকাল হইতে ভারতবর্ষের হিন্দুস্থান নামান্তর ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুগণ প্রাচীন আর্য্য হিন্দুদিগের বংশধর এবং ইঁহাদিগের অনুষ্ঠিত হিন্দুধর্ম্ম পুরাতন আর্য্য হিন্দুধর্ম্মের ছায়া। কালক্রমে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় বশতঃ হিন্দুস্থানে পুরাতন শিক্ষার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এবং পরবর্ত্তী হিন্দুসন্তানগণ অজ্ঞান অন্ধকারে পতিত হওয়ায় পূর্ব্বপিতামহগণের সভ্যতালোক নিরস্ত-প্রায় হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা বুদ্ধি সমাজ শিল্প বাণিজ্য ব্যবহার ইত্যাদি সভ্যজনোচিত যাবতীয় বিষয় বিলুপ্ত, বিস্মৃত ও ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, কেবল সংস্কারের বীজমাত্র পশ্চাৎপুরুষগণের হৃদয়ে নিমীলিত ভাবে রহিয়া যায়।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেই এই অধঃপতন সংঘটন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় রাজন্যগণ ঘোর অত্যাচারী ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠিলেন, প্রজাদিগকে নানা প্রকারে নির্য্যাতন করিয়া দেশ মধ্যে অতি ঘৃণ্য পাপাচারের প্রশ্রয় দিতে লাগিলেন। দ্বেষ হিংসা চৌর্য্য প্রতারণাদি বর্ব্বরোচিত বৃত্তিগুলি এতই প্রবল হইয়া পড়িল যে, তৎকালে ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্যাদি সাধু চরিত্রের উপাদানগুলি অতি বিরল হইয়া উঠিল ; ফলতঃ তখন হিন্দুস্থানে হিন্দু আর্য্য-বংশধরগণ যে, আর্য্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইতর অন্ত্যজ ধর্ম্মের আশ্রয় লইতে ছিলেন এবং পাপস্রোত অপ্রতিহত বেগে হিমাচল প্রদেশ হইতে ভারতমহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যখন একচ্ছত্রী সম্রাট সভামধ্যে

কুলকামিনীকে উলঙ্গ করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং সহস্র সহস্র সভ্য, রাজমন্ত্রী, রাজন্য স্বচক্ষে সেই পৈশাচিক অত্যাচারের অবতারণা দেখিয়াও নীরবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, তখন যে, দেশ কিরূপ হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা অসাধ্য, মানসচক্ষে তচ্চিত্র নিরীক্ষণ করিলেই ভারতের অধঃপতন ও ধর্ম্মহীনতার সুস্পষ্ট ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মই জগতের জীবন*, ধর্ম্ম-মূল ছিন্ন হইলে নিমেষ মধ্যেই জগৎ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অণুকণায় পরিণত হইয়া যায়। সেই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইতেই ভগবচ্ছক্তির আবির্ভাব হইল, ভারতে পুনরায় ধর্ম্মবল সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তখন ভগবানের সেই ধর্ম্মসংস্থাপিকা শক্তি যে দিব্য দেহ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া করিতে লাগিলেন, তাহা জগতে যদুবংশাবতংশ শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণ-চন্দ্রের মূর্ত্তি বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বতেজে ভারত-রাজন্যদিগকে অভিভূত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন।

হিন্দু আর্য্যগণ ধর্ম্ম-সাধনই মোক্ষলাভের এক মাত্র উপায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান ধর্ম্মসাধনের তিনটী পন্থা। বেদ কর্ম্মপক্ষপাতী এবং মহর্ষি জৈমিনী বেদের পূর্ব্বভাগ আশ্রয় করিয়া যে মীমাংসা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও কর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করা হইয়াছে; বেদান্ত বলিতেছেন, আত্মজ্ঞানই মোক্ষলাভের প্রধান সহায়, এবং মহর্ষি বাদরায়ণ বেদান্ত শাস্ত্র অবলম্বনে যে শারীরক মীমাংসা রচনা করিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বথা উক্ত মতাবলম্বী। অনেকের বিশ্বাস ধর্ম্মানুষ্ঠানের পক্ষে কর্ম্ম ও জ্ঞান মার্গই প্রাচীন-মত-সিদ্ধ পদ্ধতি, ভক্তি-পথ পৌরাণিক যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, বৈদিক সময়ে ভক্তি-পথের প্রচার ছিল না; কিন্তু এ অভিমত সমীচীন নহে। যাঁহারা ভক্তিমার্গের বৈদিকতায় সন্দিহান তাঁহা-দিগের মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন জন্যই দুই একটী প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।—

---

* "দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণোনিবৃত্তিলক্ষণশ্চ তত্রৈকোজগতঃ স্থিতি-কারণং———" শাঙ্করভাষ্যে।

প্রবৃত্তিলক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ ভেদে বেদোক্ত ধর্ম্ম দুই ভাবে প্রকাশমান, তন্মধ্যে প্রথম ভাব দ্বারা জগতের স্থিতি সংসাধিত হইতেছে।

নিরুক্ত ষড়ঙ্গ বেদের একটী অঙ্গ, মহর্ষি যাস্ক-প্রণীত নিরুক্তের নির্ব্বাচন টীকায় দেবতার সংজ্ঞা স্থলে লেখা হইয়াছে—

"দেবাঃ দাতারোঽভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ"

যাঁহারা ভক্তদিগকে অভীষ্ট প্রদান করেন তাঁহারাই দেবতা। এস্থলে স্পষ্টতঃ ভক্তি শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। আরণ্যকের উপাসনা কাণ্ডেও ভক্তিমার্গের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

কঠ, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদের শ্রুতি বচনেও স্পষ্টতঃ ও গৌণতঃ ভক্তিবিষয়ী তত্ত্ব শ্রুত হইয়া থাকে।—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন
বহুশ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে স তেন
লভ্যস্তস্যৈষ আত্মাবিবৃনুতে তনুং স্বাং"। (কঠ)।

এই (উপদিষ্ট) আত্মা (পুরুষ) বেদপাঠে লাভ করা যায় না (আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না), তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা স্মৃতিতে তাঁহাকে আয়ত্ত করা সম্ভব নহে, যথেষ্ট শাস্ত্র জ্ঞান থাকিলেও তাঁহাতে অধিকার না জন্মাইতেও পারে, তিনি দয়া করিয়া যাঁহাকে জানিবার অধিকার দেন, তিনিই সেই পরম পুরুষের তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন; অর্থাৎ যে সাধক ভক্তিবলে পরম পুরুষের অনুগ্রহভাজন হইতে পারেন, পরমপুরুষ দয়া করিয়া সেই সেবকের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন।

শ্বেতাশ্বতর আরও স্পষ্ট করিয়া ভক্তিপথের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

মহর্ষি পতঞ্জলি-প্রণীত দর্শনে যোগই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে এবং পুরাণাদি শাস্ত্র গ্রন্থেও তদুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য অনেকে ধর্ম্মসাধনায় যোগ একটী স্বতন্ত্র পন্থা বলিয়া চারিটী পন্থার উল্লেখ করেন। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ আলোচনা করিলে দেখা যায় যোগ কর্ম্মমার্গের অন্তর্গত। ফলতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে মোক্ষলাভের জন্য উক্ত তিনটী পথই প্রদর্শিত হইয়াছে; মহাভারত-কালের, অর্থাৎ ভগবান বাসুদেবের অভ্যুদয় কালের, কিছু পূর্ব্বে কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান ও যোগ-সাধনা চারিটি স্বতন্ত্র পন্থারূপে সাধকগণ কর্ত্তৃক আশ্রিত হইত; অর্থাৎ কর্ম্মাশ্রয়ীর বিশ্বাস—

একমাত্র কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই অভীষ্ট লাভ হয়; ভক্তি-পথের পথিক ভক্তিই পরমানন্দ লাভের অদ্বিতীয় শরণি ভাবিয়া অন্য সাধনগুলি উপেক্ষা করিতেন; জ্ঞানী ভাবিতেন আত্মজ্ঞান ব্যতীত পরমাত্ম-সঙ্গতি অসম্ভব, সুতরাং একমাত্র আত্মজ্ঞানই আশ্রয়ণীয়; যোগ মার্গ অবলম্বন ও তদঙ্গসাধন ব্যতীত কৈবল্য প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই বলিয়া যোগী মুক্তকণ্ঠে উপদেশ দিতেন। তৎকালে উক্ত চতুর্বিধ পথাবলম্বিগণের মধ্যে পরস্পরের মত-ভেদজনিত বাদ-প্রতিবাদে দেশে বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইতে লাগিল। যিনি কর্ম্ম-পথাবলম্বী তিনি বেদের দোহাই দিয়া নামে মাত্র যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া পশু-হত্যা ইত্যাদি নৃশংস কাণ্ডের অবতারণায় দয়া স্নেহাদি কোমল বৃত্তিগুলি বিনষ্ট করায় ভারতবাসিগণ ভীষণ নরপিশাচ মূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিলেন, ভক্তি ও জ্ঞান পথাবলম্বীদিগের মধ্যে কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাহীনতা বশতঃ ভারতে প্রকৃত ভক্ত ও প্রকৃত জ্ঞানীর অসদ্ভাব হইয়া উঠিল; যোগী যোগের নিগূঢ় রহস্য বিস্মৃত হইয়া কয়েকটি আসনমাত্র সাধন করিয়া আপনাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং যোগী কালে ঐন্দ্রজালিক হইয়া দাঁড়াইলেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে তৎকালে ভারত-বাসিগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রায় বাহ্য আচারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মহাভারত-বর্ণিত দুরন্ত রাজগণের আচরণ তাৎকালিক ধর্ম্ম-গ্লানির বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। শ্রীভগবান যদুনন্দন ভারতের বিলুপ্ত ধর্ম্মভাব পুনরুজ্জীবিত করিতেই বৃষ্ণিবংশে আবির্ভূত হয়েন।*

---

* "দ্বিবিধোহি বেদোক্তোধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ তত্রৈকোজগতাং স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মঃ ব্রাহ্মণাদ্যৈর্ব্বর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়োঽর্থিভি-রনুষ্ঠীয়মানো দীর্ঘেণ কালেন অনুষ্ঠাতৄণাং কামোদ্ভবাদ্ধীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেনাধর্ম্মে-নাভিভূয়মানে ধর্ম্মে প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণা-খ্যোবিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্ম্মঃ তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রমভেদানাম্"।

শাঙ্করভাষ্যে।

বেদে ধর্ম্মের দুই ভাবের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, যথা প্রবৃত্তিলক্ষণ, নিবৃত্তিলক্ষণ, তন্মধ্যে প্রবৃত্তিলক্ষণ ভাব হইতেই জগত সংস্থিত রহিয়াছে; ধর্ম্ম প্রাণিগণের সমুন্নতি ও কৈবল্যের প্রত্যক্ষ উপায়। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমিগণ উক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কালক্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের কামনার প্রাবল্য বশতঃ বিবেক-বিজ্ঞান মন্দীভূত হইয়া পড়ে এবং তজ্জনিত অধর্ম্ম প্রবল হইয়া ধর্ম্মভাব সঙ্কুচিত করিয়া দেন, তখন সেই সর্ব্ব-

তিনি জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি ও যোগ তদানীন্তন প্রসিদ্ধ এই চতুর্ব্বিধ সাধন-পদ্ধতি মিলাইয়া এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সেই অভিনব তত্ত্বের উপদেশ সংগ্রথিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রদর্শিত পথে অহৈতুকী ভক্তিই পরমার্থ লাভের ফল; শ্রীভগবান কৈশোরে শ্রীবৃন্দাবনধামে ব্রজগোপী ও ব্রজ রাখালগণকে ঐ অহৈতুকী ভক্তি সাধনে ব্যাপৃত রাখিয়া সেই সময় হইতেই স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্যোগ করিতে ছিলেন। সেই অহৈতুকী ভক্তিতে অধিকার জন্মিবার জন্য ভক্তিকে প্রধান রাখিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম তদঙ্গীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভক্ত সাধকের মহাভাবের অবস্থা যোগোক্ত সমাধি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিলে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতীয়মান হয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় মধ্যে বিষয়-বিশেষের প্রাধান্য থাকিলেও জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি ও যোগের শিক্ষা অল্পবিস্তর সকল অধ্যায়েই বর্ণিত আছে। অধ্যায়গুলি ছয় ছয়টী করিয়া তিনটী প্রধান অংশে বিভক্ত। প্রথম ছয় অধ্যায়ে সাধকের আত্মস্বরূপ বর্ণনা করিয়া কর্ম্ম সাধনার উপদেশ নিবদ্ধ করা হইয়াছে, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় পরম ব্রহ্মের পরিচয় প্রদান করিয়া ভক্তি সাধনার শিক্ষায় পূর্ণ, এবং তৃতীয়ে জীব ব্রহ্মের অভেদ আলোচনা করিয়া আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন (১)।

নিয়ন্তা নারায়ণ নামে পরিচিত বিষ্ণু জগতের স্থিতি ও পরিপালনেচ্ছু হইয়া ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের রক্ষাজন্য বাসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে ভগবদংশে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের রক্ষা হইলেই বৈদিকধর্ম্ম রক্ষিত হয় এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তাহার অন্তর্গত থাকায় তাহা ও রক্ষা পায়।

(১) "ষট্ত্রিকেস্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমেন ষট্কেন ঈশ্বরাংশস্য জীবস্যাংশীশ্বর-ভক্ত্যুপযোগি স্বরূপ-দর্শনম্। তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতজ্ঞানং নিষ্কামকর্ম্ম-সাধ্যং নিরূপ্যতে। মধ্যেন পরম প্রাপ্যস্যাংশীশ্বরস্য প্রাপণী ভক্তি স্তন্মহিমাপূর্ব্বিকাভিধীয়তে। অন্তেন তু পূর্ব্বোদিতানামেবেশ্বরাদীনাং স্বরূপাণি পরিশোধ্যন্তে।" শ্রীমদ্বলদেবঃ।

ত্রিষট্ক গীতাগ্রন্থের প্রথম ষট্কে (ছয় অধ্যায়ে) ঈশ্বরাংশস্বরূপ জীবের অংশিরূপ ঈশ্বরে ভক্তির উপযোগিতা এবং তাহার উপায় স্বরূপ নিষ্কামকর্ম্মসাধ্যজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে; দ্বিতীয়ে ভক্তির সাধনস্বরূপজ্ঞানের পরিচয় দিয়া পরম আশ্রয় অংশী ঈশ্বরের সঙ্গতি-সাধিকা ভক্তি এবং তদীয় মহিমা বর্ণিত হইয়াছে; তৃতীয়ে পূর্ব্বোক্ত অংশ অংশী ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞান এই পঞ্চ তত্ত্বের পরিশোধিত স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে।

"তত্রাধ্যায়ানাং প্রথমেন ষট্কেন নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগঃ তৃতীয়েন জ্ঞানযোগশ্চ বর্ণিতঃ।" বিশ্বনাথঃ।

অধ্যায় গুলির মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ, এবং তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে।

গীতা একখানি বেদান্ত গ্রন্থ বলিয়া বেদান্তবাদিগণের বিশ্বাস, এবং বৈদান্তিকচূড়ামণি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তৎপ্রতিপাদন জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়া অতি বিশদ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্যোপক্রমণিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে——

"তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থং
............অর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতঃ বিবরণং করিষ্যামি।"

[এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বৈদিক তত্ত্বের সারসংগ্রহ; ইহার অর্থ অতি গম্ভীর, সহজে ইহার ভাব গ্রহণ করা যায় না। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ জন্য সংক্ষেপে গীতার গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিব।]

"তস্যাস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপেতঃ প্রয়োজনং পরং
নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমলক্ষণং"

সংক্ষেপে বলিতে গেলে একমাত্র মোক্ষই এই গীতাশাস্ত্রের প্রয়োজন অর্থাৎ উদ্দেশ্য বস্তু।

যে শাস্ত্রে সর্ব্ববেদতত্ত্ব সংক্ষেপেতঃ নিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে যে, পরমতত্ত্ব (নিত্য-পদার্থ-তত্ত্ব) আলোচিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ কি? বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচ্য পদার্থ যে, গীতাগ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের এই উপক্রমণিকা হইতেই তাহা বিশেষরূপে বোধগম্য হইতেছে; পরন্তু শ্রীশঙ্কর স্বীয় মনোগত ভাব স্ফুটিকরণ জন্য পরক্ষণেই বলিতেছেন যে, মোক্ষই গীতার প্রয়োজন। মোক্ষ শব্দের অর্থ মায়াপনোদন, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দভাব-স্ফুরণ (বিবিধ-কার্য্য-কারণ-ভাবসমন্বিত সংসারের একান্ত নিবৃত্তি)। জীবের মায়াবরণ ছিন্ন হইলেই তাহার জীবত্ববন্ধন মুক্ত হয়, তখন জীব আর স্বতন্ত্র নহে, শিব হইতে সম্পূর্ণ অপৃথক। এই গভীরতম তত্ত্ব যে শাস্ত্রের লক্ষ্য তাহা যে বেদান্তশাস্ত্র তাহাতে সন্দিহান হইবার আর কোনও কারণ থাকে না।

বেদান্ত শাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য মহাবাক্য গীতায় অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আদ্য ছয় অধ্যায়ে মহাবাক্য-ধৃত "ত্বং" পদের বাচ্য জীবাত্মার আলোচনা করা হইয়াছে, মধ্য ছয় অধ্যায়ে "তৎ" পদের লক্ষ্য পরম তত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে, এবং অন্ত ছয় অধ্যায়ে জীবব্রহ্মের ঐক্য বিচার দ্বারা "অসি" পদের অর্থ নির্দ্ধারণ, অর্থাৎ জীব-শিব

অদ্বৈত জ্ঞানের অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায়।* ফলতঃ গীতা গ্রন্থের আলোচ্য কর্ত্তব্য-নিষ্ঠতা মধ্যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের নিগূঢ় রহস্য বিবৃত রহিয়াছে। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে গীতা বেদান্ত শাস্ত্র বলিয়া বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ নহে, মহর্ষি-বেদব্যাস-রচিত মহাভারতের অংশ বিশেষ। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়-কুমার শুদ্ধ-সত্ত্ব সব্যসাচীকে স্বীয় অবশ্যানুষ্ঠেয় ধর্ম্মযুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখিয়া তদীয় অলীক সংশয় অপসারিত করিবার জন্য যে শিক্ষা প্রদান করেন তাহাই শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়া গীতারূপে সংগ্রথিত হইয়াছে। গীতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের রচনা হইলেও উহা শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই উপদেশ-বাক্য† অনেকে বলেন মহর্ষি প্রায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখবিনিঃসৃত শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বাপর সঙ্গতি জন্য মধ্যে মধ্যে স্বয়ং শ্লোক রচনা করিয়া গ্রন্থের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন।‡

গীতা গ্রন্থের ভাষা সরল হইলেও ভাব অতি গভীর। গীতার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে স্থিরবুদ্ধি ও গভীর চিন্তার প্রয়োজন। গীতার অধিকাংশ শ্লোকই শ্রুতিমূলক। শ্রুতিবাক্য সংক্ষেপে যে তত্ত্বপ্রকাশ করেন, গীতার শ্লোক মধ্যে সেই নিগূঢ় ভাব সম্বদ্ধ রহিয়াছে; ভাষার স্তর হইতে ভাব স্তরে নিমগ্ন হইলে তবে তাহা অনুভূত হয়। গীতার শ্রুতিমূলকতা প্রকাশ জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন——

"সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতংমহৎ ॥

---

* "তত্রতু প্রথমে কাণ্ডে কর্ম্মত্যাগবর্ত্মনা। ত্বম্পদার্থো বিশুদ্ধাত্মা সোপপত্তির্নিরূপ্যতে ॥
দ্বিতীয়ে ভগবদ্ভক্তি-নিষ্ঠাবর্ণন-বর্ত্মনা। ভগবান্ পরমানন্দস্তৎপদার্থোঽবধার্য্যতে ॥
তৃতীয়ে তু তয়োরৈক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্ফুটম। এবমপ্যত্র কাণ্ডানাং সম্বন্ধোঽস্তি পরস্পরম্ ॥

† "তৎ ধর্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টঃ বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকৈরূপনিবন্ধন।"

‡ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী এই মতের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তিনি স্বীয় টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন "তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ, যথোক্তং গীতিমাহাত্ম্যে—

'গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥' ইত্যাদি।"

গোপালগণ যেমন বৎসের সাহায্যে পিপাসুদিগের তৃষ্ণা নিবারণ জন্য গাভী দোহন করিয়া অমৃতাধার দুগ্ধ প্রদান করে, নন্দগোপনন্দন শ্রীমৎ-কৃষ্ণচন্দ্র গোপালের ন্যায় অমৃতধারা প্রস্রাবিণী গাভীরূপা উপনিষন্নিচয় বৎস-রূপ পার্থকে অবলম্বন করিয়া তত্ত্ব-পিপাসু সুধীগণের তত্ত্বতৃষ্ণা নিবারণ জন্য দোহন করিয়া গীতা-দুগ্ধ প্রদান করিয়াছেন।

গীতা কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট নহে। গীতা-প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্বে আস্তিক-সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে না। সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বকালীন সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম এক গীতা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। গীতা একাধারে দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব (*Theology*)। ঈশ্বর-পরতা গীতার প্রধান শিক্ষা।

গীতা-প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে এই বলা যাইতে পারে যে, গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি আত্মীয় স্বজন দ্বারা পরিবৃত হইয়া ঐহিক সুখ সমৃদ্ধি সাধন জন্য ন্যায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার অনু-মোদিত আচার-সমূহ আসক্তিহীন-চিত্তে সাধন করিয়া, সর্ব্বমূলাধার সর্ব্বেশ্বরের সেবায় সেই সমুদায় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, এই পরম নৈষ্কর্ম্ম্য ভাব হৃদয়ে দৃঢ় সম্বন্ধ রাখিলে, ভক্তিলতায় পরজ্ঞাননিষ্ঠা-ফল ফলিতে থাকে। সেই অমৃত-রসাস্বাদে আপ্যায়িত হইলে জীব-শিব অভেদ বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং তৎকালে পরাভক্তি প্রকাশ পায়। তখন তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই থাকে না, সুতরাং মায়াবন্ধনমুক্ত হইয়া যায়। ভগবৎ-প্রেমে তখন তাঁহার হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে, তিনি জগৎ ব্রহ্মময় নিরীক্ষণ করিয়া পরমানন্দে আত্মরতি উপভোগ করেন। ইহাই গীতার চরম শিক্ষা।*

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদ। অন্ধমহারাজ গৃহে বসিয়া ভারতসমরের ব্যাপারপরম্পরা জিজ্ঞাসু হইয়া প্রজ্ঞাচক্ষু সঞ্জয়কে প্রশ্ন করিতেছেন এবং তাঁহার মুখে উত্তর শ্রবণ করিতেছেন। সর্ব্বসমেত ৭৪৫টী শ্লোকের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রের ১টী, সঞ্জয়ের ৬৭টী, অর্জ্জুনের ৫৭টী এবং শ্রীকৃষ্ণের ৬২০টী শ্লোকে গীতা-গ্রন্থ সংগ্রথিত হইয়াছে; ফলতঃ গীতার প্রধান অংশ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ ও শিক্ষা। অর্জ্জুনের বাক্যগুলি সংশয়পূর্ণ প্রশ্নমাত্র; কেবল প্রথম

---

*..........তচ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্ধর্ম্মাদ্ভবতি তমর্থমেব গীতার্থ মুদ্দিশ্য ভগবতৈবোক্তং......" শাঙ্করভাষ্যে

অধ্যায়ে ২১—২৩ শ্লোকে তিনি সমরায়োজন পরিদর্শন মানসে শ্রীভগবানকে উভয় পক্ষীয় সেনাব্যূহ মধ্যে রথস্থাপন জন্য অনুনয় করিয়াছেন, এবং ২৮ হইতে ৪৫ শ্লোকে যুদ্ধ-বৈমুখ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

কৌরবগণ মদান্ধ, অহংকারের প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি। বিনা যুদ্ধে পাণ্ডুপুত্র-দিগকে সূচ্যগ্রপরিমাণ* স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রচার করিলে অজ্ঞাতবাস-প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণসহায় মহারাজ ধর্ম্মনন্দন অগত্যা ধর্ম্মযুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। মহাভারত পাঠ করিলে মহারাজ ধর্ম্মরাজের ভারত-সমর-সমুদ্যম যে প্রকৃতি প্রেরিত ও তৎকালীন অবস্থায় একান্ত অপরিহার্য্য তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায়। প্রজাপুঞ্জের হিতসাধনার্থ সর্ব্বনিয়ন্তার নিয়ন্তৃত্বে উপস্থাপিত যুদ্ধ যে ধর্ম্মযুদ্ধ তাহাতে সংশয় নাই। মহাত্মা যুধিষ্টিরকে যুদ্ধার্থী জানিয়া কৌরবগণও স্বপক্ষীয় রাজন্যবর্গকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধের অশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ক্রমে উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থী হইয়া কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে সৈন্যসমাবেশ ও শিবির স্থাপন করিলেন। ক্ষত্রিয়তনয়গণ ক্ষাত্রধর্ম্ম প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, উভয়পক্ষের সেনা নানা প্রকার বীর্য্যাস্ফালন করিতেছে, তূর্য্যধ্বনিতে চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এমন সময় অন্ধরাজ চিন্তা করিলেন - কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র তীর্থ, তথায় পদার্পণ করিলে সর্ব্বপাপ দূর হইয়া যায়, তদীয় পুত্রগণ কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে উপনীত হইয়া তীর্থ-মাহাত্ম্যে স্বীয় কোপনভাব ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত মৈত্রবন্ধনে সম্বদ্ধ হইল কিনা। মহারাজ সন্দিহান হইয়া তৎকালে তদীয় পুত্রগণ কি করিতেছেন সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। মহারাজের এই প্রশ্নই গীতার প্রথম শ্লোক।

প্রথম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকটী ব্যতীত গীতার অন্য সমস্ত শ্লোকগুলি সঞ্জয়ের মুখে অন্ধরাজ শ্রবণ করিতেছেন, এই ভাবে রচনা করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের সৈন্য-সমাবেশ বর্ণনা এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বাক্যগুলির সূচনার জন্য সঞ্জয় যাহা বলিয়াছেন তাহা সর্ব্ব সমেত ৬৭টী শ্লোকে নিবদ্ধ, তদ্ব্যতীত অন্য যাবতীয় কথোপকথন তিনি প্রজ্ঞা-বলে অবগত হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে শ্রবণ করাইতেছেন।

গীতার প্রকৃত তত্বের আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে সৈন্য-সমাবেশ, অর্জ্জুনের সমরায়োজন নিরীক্ষণ, আত্মীয়-

---

* "সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ বিদ্যতে যাচ মেদিনী।
তদৰ্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥"

প্রিয়জন-বধোদ্যমের চিন্তায় হৃদয় দৌর্ব্বল্য, ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ ও যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ; এই কয়টী বিষয় অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ অনিত্য সংসারে লোকের আসক্তি জন্মে এবং সেই আসক্তি হইতেই শোক-তাপাদি বিবিধ সন্তাপ ভোগ করিতে হয়। আমি কে? আমার স্বরূপ কি? সম্বন্ধময় জগতে আমার সহিত কাহারও কোনও প্রকৃত সম্বন্ধ আছে কি না? এই নিগূঢ় রহস্য কয়েকটির মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিলেই জীবের সর্ব্ববন্ধন ছিন্ন হয়, তখন আত্ম-তত্ত্ব পাইয়া জীব আত্মারাম হইয়া উঠে এবং জীবত্ব ত্যাগ করিয়া শিবত্বে অধিকার লাভ করে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত জীবের ভাগ্যে শান্তি সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই আত্মতত্ত্ব অতি বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন; আত্মবিজ্ঞানই গীতার মর্ম্ম-কথা। এই আত্মজ্ঞান শোক-মোহ-ব্যাধির অমোঘ ঔষধি; এই ঔষধির পরিচয় দিবার জন্যই বিজিতেন্দ্রিয় শুদ্ধসত্ত্ব যোগসিদ্ধ সাধক ধনঞ্জয়ের জ্ঞাতিবধ-চিন্তায় শোক-জ্বর সূচনা করা হইয়াছে। ঈদৃশ রসাত্মক সূচনা হইতেই গীতা-গ্রন্থের কাব্যাংশের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমিত হইতে পারে। পরম পবিত্র তীর্থ কুরুক্ষেত্র যাহার স্থান, দ্বাপর ও কলির সন্ধি যাহার কাল, সর্ব্বশক্তিমানের ধর্ম্মসংস্থাপিকা শক্তির প্রকটবিগ্রহ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাহার প্রধান নায়ক, ভারত রাজন্য-কুল-গৌরব পশুপতিবিজয়ী ধনুর্দ্ধর বিজয় যাহার উপনায়ক, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তিযোগ-সমন্বয় যাহার অন্তর্তত্ত্ব, সেই গীতা-গ্রন্থ যে কাব্যজগতে গৌরবান্বিত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? ফলতঃ গীতা একাধারে দর্শন বিজ্ঞান কাব্য পুরাণ ইতিহাস ও উপাখ্যান। গীতার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গ্রন্থ অতি বিরল। ভারতীয় পণ্ডিতগণ গীতা হৃদয়ের ধন বলিয়া গীতার আদর বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। প্রকৃতই গীতা হৃদয়ের ধন;—টীকা টিপ্পনী ভাষ্য ব্যাখায় গীতা হৃদয়ঙ্গম হয় না, একান্ত-চিত্তে অনুধ্যান করিলে গীতার ভাব হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। গীতার প্রসর মধ্যে ভাষার অধিকার সম্ভব নহে, হৃদয়ই তথায় প্রবেশ-লাভ করিতে পারে।

শোকবিক্ষুব্ধচিত্ত মহামনা অর্জ্জুন প্রাকৃত সাংসারিক বুদ্ধিতে যুদ্ধের অনর্থত্ব বিচার এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের ন্যায় বাদ-প্রতিবাদে যুদ্ধ পরিহারই ন্যায়ানুমোদিত প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণও

অর্জ্জুনের এই দ্বিবিধ তর্কের মীমাংসা জন্য আত্মজ্ঞান ও নৈষ্কর্ম্ম্য-তত্ত্ব উপদেশ দিয়া ভক্তি ও যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত গীতায় সাংখ্য ও বেদান্তমতের বিচার স্থান পাইয়াছে, পাতঞ্জল ও মীমাংসাদর্শনের বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন "তস্যাং খল্বীশ্বর জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্ম্মাণি পদার্থা বর্ণ্যন্তে"—শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ঈশ্বর জীব প্রকৃতি কাল ও কর্ম্ম এই পঞ্চ পদার্থের আলোচনা করা হইয়াছে। ফলতঃ গীতা অতি অমূল্য উপদেশ-পূর্ণ। প্রত্যেক তত্ত্ব-পিপাসু ব্যক্তিরই গীতা-শাস্ত্র অনুশীলন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভগবদগীতা অধ্যয়ন করিয়া কার্য্য-জীবনে তদুপদেশ অনুশীলনের অধিকার সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ নহে, * সুতরাং অগ্রে অধিকার লাভের চেষ্টা আবশ্যক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুলোচনা।

(গল্প)

পিতা মাতার বড় আদরের মেয়ে সুলোচনা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন বাটী সন্নিহিত আম্রকাননে সমবয়স্কা বালিকাগণের সঙ্গে বাল্যসুলভ ক্রীড়া-নিরতা থাকিত; তখন কোন অপরিচিতের দৃষ্টি-গোচর হইলে তাহাকে অপ্সরা কন্যা, দেববালা, বা সেই নিবিড় অরণ্য সঙ্কুল প্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী বলিয়া তাহার মনে ভ্রম হইত। সুন্দর টানা টানা ভাসা ভাসা চোখ দুটি, নীল অম্বুধির বারিরাশির উপর অস্তাচল চূড়াবলম্বী তপন কিরণের সৌন্দর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া যেন সেই সুশ্রী মুখ খানির আরও সরলতা প্রকাশ করিতেছে। বালিকার মুখশ্রী এবং অঙ্গ সৌষ্ঠব নয়ন-গোচর হইলেই মনে হয় যেন বিধাতা বিরলে বসিয়া এই অপরূপ প্রতিমার সৃষ্টি করিয়াছেন। সমবয়স্কাগণের সহিত ক্রীড়া কালীন বালিকার সেই ভ্রমর কৃষ্ণ কেশদাম ইতঃস্ততঃ বিন্যস্ত হইয়া আরও সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিত।

---

* "অস্য শাস্ত্রস্য শ্রদ্ধালুঃ সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠো বিজিতেন্দ্রিয়োঽধিকারী। স চ সনিষ্ঠ-পরিনিষ্ঠিত-নিরপেক্ষভেদাৎ ত্রিবিধঃ। তেষু স্বর্গাদি-লোকানপিদিদৃক্ষুর্নিষ্ঠয়া স্বধর্ম্মান্ হর্য্যর্চ্চনরূপানাচরন্ প্রথমঃ (সনিষ্ঠঃ)। লোকসংজিঘৃক্ষয়া তানাচরন্ হরিভক্তিনিরতঃ দ্বিতীয়ঃ (পরিনিষ্ঠিতঃ) স চ সাশ্রমঃ। সত্যতপোজপাদিবিশুদ্ধচিত্তেন হর্য্যেকনিরতস্তৃতীয়ঃ (নিরপেক্ষঃ নিরাশ্রমঃ।"

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ।

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়ী বালিকা সুলোচনা ক্রমে ক্রমে বয়স্থা হইল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কমল যেরূপ প্রস্ফুটিত হয়, চন্দ্রোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুমুদ যেরূপ বিকশিত হয়, যৌবনোদগমের সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ তাহার সৌন্দর্য্যরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ সৌন্দর্য্য অলৌকিক, অতুলনীয় ! !

অলৌকিক রূপরাশির শুধুই আদর করা যায় না, মানসিক ভগবচ্চিন্তা জনিত যে এক অন্তর অসীম সৌন্দর্য্যের নৈসর্গিক বিকাশ হয়, সে সৌন্দর্য্য প্রত্যুত পবিত্র হইতে পবিত্রতর।

তবে এই উভয় সৌন্দর্য্যই যাহাতে বর্ত্তমান তিনিই বাস্তবিক পূজ্য, আদরণীয়, এবং বরেণ্য। লক্ষ্মী সরস্বতী একাধারে করুণাবর্ষণ করিলে যেরূপ কমনীয়তা, স্নিগ্ধভাব, পবিত্রতা, এবং বাগ্মিতা প্রভৃতি গুণে সে ব্যক্তি ভূষিত হইয়া থাকে ; সেইরূপ এ ভূষাও অপরূপ সৌন্দর্য্যের সঞ্চার করিয়া থাকে। বালিকা সুলোচনার বয়সের সহিত, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি সদ্‌গুণ নিচয় তাহার অন্তঃকরণের অধিকারী হইতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্যক্তি মাত্রেই বলিত "মেয়ে হইতে হইলে যেন বিশ্বনাথের মেয়ের মত হয়, আহা, কেমন মেয়ে, দেখিলেই শরীর ও মন পবিত্র হয়, চক্ষুও শীতল হয়। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। এরূপ মেয়ে লাভ বহু ভাগ্যের ফল।"

(২)

কন্যা বয়স্থা হইলে সাধারণতঃ যেরূপ অর্থাভাবে এবং দুশ্চিন্তায় পিতা মাতাকে অনশনে দিন যাপন করিতে হয়, সুলোচনার পিতা মাতার এখন সেই অবস্থা উপস্থিত হইল। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী অল্প বয়স্কা কন্যাকে উপযুক্ত সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পারিলে গৌরীদানের পুণ্যলাভ হয় ; অন্যথাচরণে পিতা মাতাকে নিরয়গামী হইতে হয়। বরানুসন্ধান চলিতে লাগিল, কিন্তু সকলেই প্রচুর অর্থ চাহিল। সুলোচনার পিতার অবস্থা সেরূপ সচ্ছল নহে, তাঁহার আয় অতি অল্প, সুতরাং কন্যাকর্ত্তা পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হইলেন।

অনেক অনুসন্ধানে একটি সুপাত্র মিলিল। শুভদিনে এবং শুভলগ্নে এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, কিন্তু কন্যাকর্ত্তা বিশ্বনাথ বাবু এই কন্যাদানে সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। এতাদৃশ সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কন্যাদানেও কন্যাকর্ত্তা বিশ্বনাথ বাবু মানসিক শান্তি পাইলেন না। দরিদ্র বিশ্বনাথ তাঁহার বাস্তবাটী পৈতৃক ভদ্রাসন অলঙ্কারাদি সমস্ত দ্রব্যের বিনিময়ে এই

বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি গরবিণী বৈবাহিকার মনস্তুষ্টি সাধনে সমর্থ হ'ন নাই। বৈবাহিক-বাটী হইতে ফুলশয্যার তত্ত্ব লইয়া যে ব্যক্তি আগমন করিল গর্ব্বিতা গৃহিণী তাহাকে নানা কটু তিরস্কার দ্বারা পুরস্কৃত করিয়া বিদায় করিলেন। বাক্যযন্ত্রণায় বালিকা সুলোচনার আর দুঃখের ও কষ্টের অবধি রহিল না। সে দিবস ফুলশয্যার রাত্রিতে স্বামী যদি দেখিতেন, দেখিতে পাইতেন কোমলপ্রাণা কাতরা বালিকার সুন্দর বদন মণ্ডলে মুক্তাবিন্দুনিভ কয়েক ফোঁটা অশ্রু, কপোল দেশ বহিয়া পতিত হইতেছে।

অষ্টমঙ্গলায় বিশ্বনাথ কন্যা আনয়ন জন্য বৈবাহিক ভবনে গমন করিলেন। আহা, পিতৃমাতৃহৃদয় সন্তানের জন্য সততই ব্যাকুল! বৈবাহিকা বলিয়া পাঠাইলেন "বেয়াই কোন্ লজ্জায় মেয়ে নিতে এসেছে? চোখখেকো মিন্সের কি কোন আক্কেল নাই? তাঁর মেয়ে কি জলে পড়ে আছে। বৌ পাঠাব না, আমার খুসী। যদি কখন অনন্ত দিতে পারেন বা অনন্তর মূল্য আড়াইটিশ টাকা দিতে পারেন, যেন একটি পয়সা কম না হয়, তবে মেয়ে নিয়ে যাবেন। নইলে আমি এমন মেয়েই নই, কই বাপের বাড়ীর নাম করুক দেখি, মা বাপ মরে গেলেও পাঠবনা।"

রোষপরায়ণা গর্ব্বিতা গৃহিনী, বধুর সাক্ষাতেই বৈবাহিকপ্রদত্ত মিষ্টান্নের হাঁড়ি পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, বালিকা সুলোচনার অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। এই এক হাঁড়ি মিষ্টান্ন তাঁহাদের নিকট তুচ্ছ বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার দরিদ্র পিতার ইহা কত কষ্টসঞ্চিত ধন! এই সামান্য টুকু সঞ্চয় জন্যই যে তাহার কত তপ্তশ্বাস পতিত হইয়াছে। হায়, তাহার স্নেহময় পিতা আজি তাহারই জন্য পথের ভিখারী!

(৩)

বুদ্ধিমতী বালিকা সুলোচনা অল্পদিন মধ্যেই শ্বাশুড়ীকে চিনিতে পারিয়াছিল, বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন জল মার্জ্জনা পূর্ব্বক ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। তাহার পর ছয় মাস উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুলোচনা শ্বশুরালয়েই আছে; কিন্তু বাল্যে যে স্থানটিতে প্রতিপালিত হইয়াছে, যে করুণাধারায় ক্ষুদ্র লতিকাটির ন্যায় শৈশব হইতে যৌবনাবধি, কত স্নেহে, কত যত্নে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই স্থানটির কথা অদ্যাপিও তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে ক্ষণকালের নিমিত্তও অপসৃত হইত না। দিবা দ্বিপ্রহরে স্নেহময়ী মাতার সেই শান্তিময়

মুখচ্ছবি, পিতার সেই স্নেহময় মূর্ত্তি, তাহার অন্তরে উদিত হইয়া প্রাণে আরও ব্যাকুলতা হইত; বালিকার নয়ন দুটি জলে টস্ টস্ করিত। অপরাহ্নে যখন নদীতে জল আনিবার জন্য গমন করিত, তখন যে পথে সে পিত্রালয় হইতে আগমন করিয়াছে, সেই পথে গোশকট শ্রেণী দৃষ্ট হইলে তাহার প্রাণ আকুল হইয়া যেন ক্রন্দন করিয়া বলিত, "মা গো, কবে বাড়ী যাব?" উপরে নানাবিধ পক্ষীকুল কলরব করিতে করিতে উড়িয়া যাইত, বালিকা সুলোচনা একাগ্র চিত্তে তাহাই দেখিত ও তাহার মনে হইত "আহা, এই সকল পাখীগুলি তো আমাদের ছাদের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবে, আমি যদি পাখী হইতে পারিতাম!" যদি প্রত্যহ রাত্রিতে কেহ দেখিতেন, দেখিতে পাইতেন সকলেই ঘোর নিদ্রাভিভূত কিন্তু বালিকা সুলোচনা বিনিদ্র অবস্থায় উপাধান সিক্ত করিয়া কত রাত্রি অতিবাহিত করিত।

সুলোচনার স্বামী বিমলচন্দ্র কলিকাতা কলেজে অধ্যয়ন করেন, মধ্যে মধ্যে বাটী আসিয়া থাকেন; কিন্তু এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি, কি জানি কেন বিধাতা বিমলচন্দ্রকে কিরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মাতার স্বভাব হইতে তিনি একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তবে কাহারও স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কথা বলিতে পারেন না। বাটিতে যখন আগমন করেন, সকলই শ্রবণ করেন এবং নীরব থাকেন; বিশেষ জ্যেষ্ঠা ভগিনী আছেন তাঁহাকে সকলেই ভয় করিয়া থাকে, যেহেতু তিনি বালবিধবা, আজন্ম ভ্রাতৃগৃহবাসিনী এবং মাতার মন্ত্রিস্বরূপিণী।

সুলোচনার নেত্রে অশ্রুবিন্দু দেখিলে, বিমলচন্দ্রের চক্ষুদ্বয় জলপূর্ণ হইয়া আসিত। একদিন নিভৃতে বিমল তাহার দিদিকে বলিল, "দিদি, বৌএর রোজই রাত্রে একটু একটু জ্বর হয়, যদি কোন দোষ হয়ে থাকে ক্ষমা করে এইবার একবার পাঠিয়ে দিও, ছেলে মানুষ বোধ হয় বাপের বাড়ীর জন্য ভাবনা হয়।"

বিমলচন্দ্রকে আর অধিক বলিতে হইলনা দিদি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন "বা, বা, বিয়ে, তোর এখন বেশ টনটনে জ্ঞান হয়েছে, দেখ্‌ছি; মার মত গেল, আমার মত গেল, গুরুজনের মত গেল এখন ছেলেদের মতে কাজ হবে। বেশ, বেশ, ভাল তাই করিস, পাল্কী বেহারা ডাক্‌তে কোথা দেরী হয়ে যাবে, যা কাঁধে করে দিয়ে আয়। আহা, কচি খুকী, ননীর পুতুল

আতপে গলে গেল।" বিমলচন্দ্র আর বলিতে সাহস করিলেন না, অবনত বদনে নীরবে প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে বিমল একটি গণ্ডমূর্খ, স্ত্রীবশ, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিরোধী, তাহা চতুর্দ্দিকেই রাষ্ট্র হইয়া পড়িল এবং সকলেই একটা কথা পাইয়া পরম আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। রমণীগণও ঘাটে জল আনিবার কালীন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চারিদণ্ড গল্প করিবার একটা ছুতা পাইলেন। পরদিনই বিমলচন্দ্র কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন, তাহার পর বিমল আর একবৎসর বাটী আসিল না।

একদিবস সুলোচনার পিত্রালয় হইতে তাহার পিতার প্রেরিত একজন লোক আসিয়া সংবাদ প্রদান করিল "সুলোচনার মাতা সংশয়াপন্ন কাহিল, তিনি মৃত্যুকালে একটিবার কন্যাকে দেখিতে চাহেন, তাহার পিতা বড়ই বিব্রত, নহিলে তিনিই আসিতেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার এই অন্তিমের অনুরোধটী রক্ষা করিতেই হইবে। সুলোচনাকে একটী বার পাঠাইয়া দিয়া দয়া প্রকাশে অন্যথা না হয়। বৈবাহিকের প্রেরিত লোক গৃহিণীর তর্জ্জন গর্জ্জন ও তিরস্কারের চোটেই পলায়ন করিল।

দুইদিন পর সংবাদ আসিল সুলোচনার মাতা মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়া সংসারের সকল মানসিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। কন্যাবৎসলা জননীর তনয়াবিরহরূপ যে জলন্ত বহ্নি দিবানিশি হৃদয়াভ্যন্তরে প্রজ্জ-লিত ছিল, হায়! তাহা চির দিনের জন্য নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। মায়ের মৃত্যুতে বালিকার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। আহা, সুলোচনা মাতাকে স্মরণ পূর্ব্বক হাহাকার করিতে লাগিল। শশ্রূর গঞ্জনা, নিষ্ঠুরা ননদিনীর বিষসদৃশ বাক্য-বাণ, বিদ্রুপ পূর্ণ হাস্য, কিছুই তাহার নিদারুণ ক্রন্দন প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। তদবধি সুলোচনা আরও রুগ্না হইল। ক্রমে সে শয্যা লইল। সুলোচনা আর সে কোমল সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলমালাটির ন্যায় নাই। এখন আর তাহাকে চিনিবার উপায় নাই। তাহার সেই তপ্তকাঞ্চননিভবর্ণ কালিমাময়, সে সুন্দর বদন মণ্ডল শুষ্ক ও বিবর্ণ। কেহ কখন বধুর সংবাদ চাহিলে করুণাময়ী শশ্রূ ও ননদিনী তাচ্ছিল্যের হাস্য হাসিয়া উত্তর প্রদান করেন, "তেমনই আছে, আর কি, কইমাছের পরাণ, ও কি মরবার?'

বিমল চন্দ্র আজি একবৎসর বাটী যান নাই, বাটী হইতে আর নিয়মিত

পত্রাদিও আসেনা। বিমল অদ্য প্রাতঃকাল হইতে নানাকাজে মনোনিবেশের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কি জানি কি কারণ তাহার হৃদয়াভ্যন্তরে থাকিয়া থাকিয়া কোনও একটা বিপদাশঙ্কা জাগিয়া উঠিতেছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অন্যমনস্ক হইবার নিমিত্ত টেবিলটির নিকট গমন পূর্ব্বক ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি বই খুলিতে যাইবেন, এরূপ সময় কে একজন তাঁহাকে আহ্বান করিল, সত্বর বাহিরে আসিলেন, তারবাহী পিয়ন বলিল "বাবু তার আছে"।

বিমলচন্দ্র সহি করিয়া, টেলিগ্রামটি হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে টেবিলটির নিকট আগমন করিলেন। আবরণ উন্মোচন করিতে যেন সাহসই হয়না; অদ্য পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই দিনে এইরূপে এই সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু সংবাদ এই নিষ্ঠুর টেলীগ্রাম তাহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। অদ্য বিমলের মনে সেই দিন উদয় হইল। কম্পিত হস্তে ধীরে ধীরে আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ করিলেন, তাঁহাকে সত্বর বাটী যাইবার জন্য লিখিয়াছে। টেলীগ্রামের মর্ম্ম অবগত হইয়া বিমল আরও ব্যগ্র হইলেন, কি জানি তাঁহার মনে আরও নানা দুশ্চিন্তা জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। তথাকার বন্দোবস্ত করিয়া বিমল সেই দিবসই বাটী যাত্রা করিলেন।

ট্রেন ঝটিকা বেগে ছুটিতেছে। চিন্তাক্লিষ্ট বিমল অবসন্ন ভাবে একটি বেঞ্চে উপবেশন করিয়া আছেন। শুভ অশুভ কত চিন্তাস্রোত তাঁহার হৃদয় আলোড়িত করিতেছে; ক্রমে দ্বিপ্রহরের খরতর রৌদ্র সত্বরই তাহাকে ক্লান্ত করিয়া ফেলিল, সহসা একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল, কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণ, নিদ্রাবস্থায় বিমল স্বপ্ন দেখিল সে একটী রমণীয় পর্বতের অতি উচ্চে আরোহণ করিয়াছে, অতি সুন্দর পর্ব্বত, তাহার নিম্নে চতুর্দ্দিকে বীচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত ফেনিল তটিনীর অপূর্ব্ব শোভা, এবং সুদূরে অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা ভিন্ন কিছুই দৃষ্ট হয় না। উপরে নীলাকাশ; সহসা ঊর্দ্ধ হইতে কে যেন তাহাকে আহ্বান করিল সে বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, উপরে সুন্দর স্বর্গরাজ্য—স্বর্গে যেন এক অপরূপ স্বর্গীয় জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, সেই ধবল কৌমুদী স্নাত নিশীথে একটি মনোরম পুষ্পোদ্যানে অতি পরম লাবণ্যময়ী স্বর্গের পারিজাত মালায় সুশোভিতা, স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায় একজন দেববালা দণ্ডায়মানা; তিনিই মৃদুস্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। মরি! মরি! কি সুন্দর রূপ! দেব কন্যার মুখখানি যেন ঠিক সুলোচনার মুখের ন্যায়।

বিমল চন্দ্র বিস্মিত হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্বর্ণ প্রতিমারূপিনী তাহাকে বলিলেন "এস, এখানে আস্‌বে এখানে কোন কষ্ট নাই, এস" ?

মরি, মরি, কোমল সুমধুর বীণার ঝঙ্কারের ন্যায় সুললিত স্বর! বিমল চন্দ্র সম্মতি জানাইল। চমকিত ভাবে নিদ্রাভঙ্গ হইল।

(৫)

বিমল চন্দ্র আরও ব্যগ্র হইল, কখন গিয়া সকলকে দেখিব এই চিন্তাই তাহার সর্ব্বসার হইল। যথা সময় স্বস্থানে পৌঁছিল। ষ্টেশন হইতে বাটী ততদূর নহে, বিমল চন্দ্র পদব্রজেই সত্বর যাইতেছেন, কিন্তু পা যেন আর চলেনা। উদ্বেগ পূর্ণ হৃদয়ে চলিতে চলিতে সহসা মনে আশঙ্কা হইল "কেন ওরূপ টেলীগ্রাম পাইলাম, সুলোচনা ভাল আছে তো? কই টেলী-গ্রামেতো বিশেষ কিছু লেখা নাই, না সুলোচনা ভাল আছে—আমাকে না জানি বালিকা হয়ত কতই তিরস্কার করিবে, কত দিন বাটী আসি নাই! আহা, তাহার সেই সরলতামাখা মলিন মুখ খানি আমাকে দেখিলেই প্রফুল্ল হয়। না সুলোচনা ভাল আছে, কিন্তু যদি শুনি সুলোচনা নাই? দয়াময় হরি তুমিই ভরসা, বাটী অতি নিকট, পথিমধ্যে এক পরিচিত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল সে জিজ্ঞাসা করিল "কি বিমল, বাড়ী এলে?" বিমল তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া যেন একটু আশ্বস্ত হইল, বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, টেলীগ্রাম পেয়ে বড় ব্যস্ত হয়ে আসিতে হয়েছে; বাড়ীতে সব ভাল আছে জানেন?" শ্রবণ মাত্র সে ব্যক্তি মুখ ফিরাইয়া ব্যস্ত ভাবে চলিয়া গেল, কেবল বলিয়া গেল "গেলেই দেখিতে পাবে"।

বিমলচন্দ্রের মুখে সহসা আরও যেন কে বিষাদরাশি ঢালিয়া দিল। ধীরে ধীরে বাটীতে উপস্থিত হইল, কই বাহিরে তো কেহই নাই, কান্নার শব্দ ও তো পাইনা ভাল আছে বৈকি সব!

এমন সময়ে যাহা দেখিল তাহাতে ভীতিবিহ্বল হইয়া থমকিয়া দণ্ডায়-মান হইল। দেখিল তাহাদেরই চারিজন প্রতিবাসী ব্যক্তি সিক্তবস্ত্রে তাহা-দেরই বহির্ব্বাটীতে আসিয়া, উচ্চৈস্বরে মুহুর্মুহু হরিধ্বনি করিল; সে শব্দে যেন সেই হতভাগ্যের হৃদয় ভাঙিয়া গেল। দেখিল গৃহাঙ্গনে তাহার মাতা ও ভগিনী দাঁড়াইয়া। তাহার আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না।

সেই চারি ব্যক্তির মধ্যে বিমলের বয়স্য একজন ছিল, সে গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "বিমল তুমি এতক্ষণে এলে? এই আমরা তোমারই প্রাণের পুতলী

সুলোচনাকে রেখে আস্‌ছি।” বিমল আর থাকিতে পারিল না, হতভাগ্য যুবক মাথায় হস্ত দিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, ক্রমে রজনী অধিক হইল, কিন্তু বিমলকে কেহ উঠাইতে সমর্থ হইলেন না। দিদি আসিয়া সান্তনা দিলেন “বিমু’নে, ওঠ, আর অত ভাবেনা।”

মাতা আসিয়া বলিলেন, “ভাবনা কি বাবা, আমি বেঁচে রয়েছি ভাবনা কি? বৌ কত মরে, আবার বিয়ে দিয়ে রাঙ্গা টুকটুকে বউ আনবো। ও কোথাকার রোগাপুঁয়ে আমাদের কপালে দুঃখ দিতে এসেছিল। নে, ওঠ ঘরে চল, আবার বিয়ে দেব, এবার আর যে সে ঘরে নয়, টাকা গহনা সব দেখে নেব, দয়াকরে আর ছেড়ে দেব না” মাতার নয়ন কোণে হাস্য রেখা দেখা যাইতে লাগিল। বিমল মাতার বাক্যের উত্তর দিতে সমর্থ হইল না, তখন তাহার মন সে দিকে ছিল না, গৃহিণী ভাবিলেন ছেলে একটু বিমনা হয়েছে আবার বিয়ে দিলেই সব ভুলে যাবে।

তিনি তখনই মনে মনে কল্পনা আঁকিয়া প্রস্তুত রাখিলেন, এবার আর ওরূপ যেখানে সেখানে পুত্রের বিবাহ দিবেন না। এবার অগ্রেই অলঙ্কারাদির ভালরূপ বন্দোবস্ত না করিলে বিবাহ দিবেন না।

এবার যেন আর তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া কৃপা পূর্ব্বক ছাড়িয়া না দিতে হয়, কড়া গণ্ডা সকলই উত্তমরূপ বুঝিয়া লইবেন। গতবারকার দানের তৈজস গুলি যেন একটু কেমন কেমন হইয়াছিল, এবার আর তাহা হতে দিবেন না, উত্তমরূপে দেখিয়া গ্রহণ করিবেন নচেৎ পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন।

জননীর আকাশ কুসুম বিধিবিড়ম্বনায় বিফলতা লাভ করিল। পরদিন বিমল চন্দ্রকে আর কেহ গৃহে দেখিতে পাইলনা; বাটী সন্নিহিত পুষ্করিণী-সলিলে বিমলের প্রাণহীন দেহ ভাসিতে দেখা গেল।

শ্রীমতী চম্পক বরণী দাসী।

বৈষ্ণব মহাসম্মিলন।

(১)

ভারতে বা বঙ্গে হিন্দুজাতি এমনভাবে আপনার সমাজ গঠিত করিয়াছিল, যে একদিনও তাঁহারা মনে করেন নাই পৃথিবীতে অপর মানবসমাজ আছে। কালে সেই সমাজের লোকের সহিত তাঁহাদের প্রতিযোগীতা বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। কথায় কথায় হিন্দুর জাতি যাইত, প্রতিপদে হিন্দুকে পতিত হইতে হইত। নানা বৈষম্যের মধ্য দিয়া এই ভাবে হিন্দুর জাতীয় জীবন গঠিত হইয়া জন্মার্জ্জিত সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। ছত্রিশ জাতির লোক লইয়া হিন্দুসমাজ গঠিত। এই জাতির মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চ শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শেও যাইতে পারিত না। সমাজ তাহাদিগকে একবারে অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। তারপর আচার ব্যবহার ছাড়িয়া দিলেও ধর্ম্মাচরণেও সকলের অধিকার ছিল না। ক্রিয়াকাণ্ডই কেবল ধর্ম্মাচরণ হইয়া সমগ্র জাতিকে কুসংস্কারের ক্রিয়াপুতুল করিয়াছিল। যতই দিনের পর দিন যাইতেছিল ততই হিন্দুর ধ্যান ধারণাশক্তিহীনতা বশতঃ নানাপ্রকার বৈষম্যের অধীন হইতেছিল। আত্মহারা হিন্দুজাতি আপনার প্রাণের পিপাসা মিটাইতে না পারিয়া কেবল ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়াছিল। হিন্দুর বিশ্বাস সমাজ ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য, কুক্রিয়া ও পাপতাপের মূল ছেদনের জন্য, ভগবান যুগে যুগে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই আশায় হৃদয় বাঁধিয়া সেই সৃষ্টির অনাদিকাল হইতে হিন্দু বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বয়ং নারায়ণ; যাহার নাম “সনাতন ধর্ম্ম” তাহার রক্ষা ভগবানই করিবেন। এই ধ্যানে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মন্ত্রপুত চক্ষে সেই যুগাবতারের আগমন প্রতীক্ষায় কাল অতিক্রম করিতেছিল। পঞ্চাদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে সেই প্রকার চিন্তা-বিপ্লবে মানব-মনপ্রাণ বিমোহিত হইয়া এক অভিনব ধর্ম্ম-বিপ্লবের সূচনা করিতেছিল। স্বেচ্ছায় হউক আর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক দলে দলে লোক ভয়াবহ পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল। বেদান্তের গভীর সূত্রবাদ, তান্ত্রিকের জটীল ক্রিয়াকাণ্ড সরল বিশ্বাসীর তাপিত প্রাণ শীতল করিতে অপারগ হইয়াছিল। লোকে ভক্তিযোগের সহিত প্রেমবন্যায় ভাসিয়া মুক্তি কামনায় অলক্ষ্যে অধীর হইতেছিল। লোকহৃদয়ের এই অতৃপ্ত বাসনার তৃপ্তির জন্য সাধারণের বোধগম্য সাধনার সরল পথপ্রবর্ত্তক, ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরের

আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সময়ে মহাসাগরের অন্য পারে পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্টশিষ্যগণের মধ্যে মার্টিন লুথার খৃষ্টধর্ম্মের এক নূতন বৈজয়ন্তী উড়াইয়া লোককে বিচলিত করিয়াছিলেন। জগতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নব ধর্ম্মোন্মাদ আপনা হইতে উদ্ভাবিত হইয়া সময় স্রোতের গতি ভিন্ন দিকে ঘুরাইয়া দিতেছিল। এই প্রকারে মহাকালের শাসন বিপর্য্যস্ত করিয়া প্রেম ও ভক্তি মানবহৃদয়ে আপনার সিংহাসন পাতিতেছিল।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় বাঙ্গালার সহিত আসামের অভিন্ন সম্বন্ধ আছে। আসাম নাম "আহম" রাজ্য হইতে হইয়াছে। এই দেশের পৌরাণিক নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর। রামায়ণে ও মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। কোন সময় হইতে এইদেশে হিন্দুধর্ম্মের শাসন প্রচলন হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। অল্প দিন হইল রাজশাসনে বঙ্গভাষা আসাম হইতে বিতাড়িত হইয়া অসমীয়া নামে বঙ্গাক্ষরে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইতেছে। আসামের সহিত বাঙ্গলার আর ভাষাগত মিলের সম্ভাবনা নাই। বঙ্গদেশের কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি পাঠে জানা যায়, বঙ্গদেশ হইতে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আসামে যাইয়া বসবাস করেন এবং আসামে হিন্দুধর্ম্মের বা ব্রাহ্মণশাসনের প্রবর্ত্তনা করেন। ত্রিপুরারাজ্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ৫১ ত্রিপুরাব্দে রাজা শ্রীধর্ম্মপা স্বীয় রাজ্যে ব্রাহ্মণ আনাইয়া বসবাস করান। এই ব্রাহ্মণগণ দাক্ষিণাত্য বৈদিক বলিয়া খ্যাত। ইহাঁদের প্রভাব আজও বঙ্গদেশের ধর্ম্মজীবনের উপর দিয়া খরস্রোতে প্রবাহিত আছে। যে সকল কায়স্থ আসামে যাইয়া বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে আসামের চণ্ডীদাস দ্বাদশ ভৌমিকের পদলাভ করিয়া প্রাধান্যের সহিত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই চণ্ডীদাসের চারিপুরুষ অন্তর আমরা আসামে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শঙ্করদেবকে দেখিতে পাই। ইহাঁর পিতার নাম কুসুমবর, জননী সত্যসন্ধ্যা। "রুদ্র যামল" নামক গ্রন্থে জানা যায় শঙ্করদেব কলি-যুগের ৪৫৫০ বৎসর অতীত হইলে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। আসামের 'চরিত-সংহিতা' পাঠে অবগত হওয়া যায় যে শঙ্করদেব :—

শাকে শুভ্রাংশু সপ্ত জলন
শশীমিতৌ যোঽবতীর্ণো ধরিত্র্যাম্‌।
স শ্রীশঙ্কর শ্রীহরিপদ
মগমরৎ রোম—দ্ব্যা—ব্ধি চন্দ্র॥

১৩৬১ শকাব্দে ভূমিষ্ঠ হন অর্থাৎ ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ তাঁহার জন্মকাল। আসাম ইতিহাস লেখক গেইট সাহেবের মতে শঙ্করদেব ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন। শঙ্করদেব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রেম ভক্তিতে মাখিয়া প্রচার করিতে থাকায় ব্রাহ্মণগণের সহিত তাঁহার ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে রাজাদেশে প্রাণের ভয়ে কুচবিহার-রাজ নরনারায়ণের আশ্রয় লইয়া আপনার ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন। শঙ্করদেব যে সময়ে তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া "চরিত" লেখকগণ বলেন। আসামে যে প্রেমভক্তির প্রবাহ ছুটিয়া অনন্ত সাগরে মিলিত হইয়াছিল, তাহাই নবদ্বীপে আসিয়া সুরধনীর জলে মিলাইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যুগাবতারে লীন হইয়াছিল।

এই সময়ে আসামের শ্রীহট্ট প্রদেশ বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল। একটী সামাজিক গোলযোগ যেন ভগবৎ প্রেরণায় সংঘটিত হইয়া বঙ্গের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিয়া দিয়াছিল। এই শ্রীহট্ট প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম "লাউড়" (Lahour)। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন সুবিদনারায়ণ। রাজা বৈদিক ব্রাহ্মণ কিন্তু একজন বল্লালী বীর। বৈদিক ব্রাহ্মণেরা বল্লালী কুলমর্য্যাদা গ্রহণ না করিলেও তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার কৌলিন্যপ্রথা চলিত ছিল। রাজা শ্রীধর্ম্ম-পা আনীত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কাত্যায়ন গোত্রীয় শ্রীধর একজন। এই শ্রীধর হইতে ২৭ পুরুষান্তরে আমরা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে দেখিতে পাই। এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর দুই পুত্র রঘুপতি ও রঘুনাথ। এই রঘুনাথের সহিত কৌশলে রাজা সুবিদনারায়ণ আপনার খঞ্জা কন্যা রত্নবতীর বিবাহ দেন। রঘুনাথ তখন শিশু। আপনার কুলমর্য্যাদা হানি হওয়ায় জননী জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুপতিকে পরিত্যাগ করিয়া রঘুনাথকে লইয়া নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। এই রঘুনাথই বঙ্গের শিরোমণি হইয়া মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের শিষ্যত্ব পরিগ্রহণে সমগ্র ন্যায় শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া নবদ্বীপে বীণাপাণি বাগ্‌দেবীর সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বঙ্গে এই সময় হইতেই ন্যায়ের শাসন প্রচলিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ব পুরুষগণের বসবাস উৎকলের জাজপুরে ছিল তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক। রাজা ভ্রমরের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আপনার স্বজাতিগণের নিকট পলাইয়া শ্রীহট্টে আসিয়া বসবাস করেন। এই

বংশের জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে বিদ্যাশিক্ষার্থী হইয়া আইসেন। পাঠ সমাপনান্তে আর দেশে ফিরিয়া যান নাই। নবদ্বীপেই টোল খুলিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকেন। এই জগন্নাথ মিশ্রের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ যৌবনে বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ প্রেমভক্তির অবতার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অদ্বৈতাচার্য্যও লাহুড়ের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কোনও অজ্ঞাত কারণে শান্তিপুরে আসিয়া আপন বাস স্থাপন করেন। শ্যাম-দাস প্রণীত "অদ্বৈত মঙ্গল", ঈশাননাগর প্রণীত "অদ্বৈত প্রকাশ", লাউ-রিয়া কৃষ্ণদাস প্রণীত অদ্বৈতের "বাল্যলীলাসূত্র" প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব কবির গ্রন্থে অদ্বৈতজীবনী সবিস্তারে বর্ণনা আছে। ঈশান নাগরের মতে।—

"নৃসিংহ সন্ততি লোকে যারে গায় ॥
সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার সন্ততি ॥
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ীয় বাদসাহ মারি গৌড়ে হ'ল রাজা ॥"

আমরা ইতিহাসে পাই রাজা কংশ দ্বিতীয় সামসুদ্দিনকে পরাজয় করিয়া গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন। লেথব্রিজ সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে আছে রাজা গনেশ দিনাজপুরে স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করেন। কংশের পতনের পর নৃসিংহ প্রাণভয়ে লাউড়ে পলাইয়া যান। এই নৃসিংহকে লইয়া বারেন্দ্র সমাজে এক মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার চিহ্ন "কাপ" নামে এখনও বারেন্দ্রসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। নৃসিংহ কোনও এক সামাজিক ভোজে পরিত্যক্ত হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ মানসে সে সময়ের শ্রেষ্ঠ কুলিন মধু-মৈত্রেয়ের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দেন। এই বিবাহে মধু মৈত্রেয়ের সহিত তাঁহার পুত্রগণের বিরোধ হওয়ায় পিতৃদ্বেষী পুত্রগণ কৌলিন্য ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। ধন্য বল্লালী মোহ !!!

আমরা ঈশান নাগরের লেখা হইতে একটি ঐতিহাসিক তারিখ পাইয়াছি।' অদ্বৈত মহাপ্রভু বয়সে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবাপেক্ষা ৫২ বৎসরের বড় ছিলেন এবং তিনি ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। কবি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-দেবকে দর্শন করায় পর অদ্বৈতাচার্য্যের মুখ দিয়া বলাইতেছেন—

"ওহে বিভু আজ দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হইল।
তুয়া লাগি ধরা ধামে এ দাস আইল ॥" (অদ্বৈতপ্রকাশ)

গ্রন্থ শেষে কবি বলিয়াছেন—

"সয়াশত বর্ষ প্রভু রহি ধরা ধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে ॥" (অদ্বৈত প্রকাশ)

কবির এই বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে অদ্বৈতাচার্য্য শঙ্করদেব অপেক্ষা ১৬ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি পরিপক্ক বয়সে তিনি শান্তিপুর আসিয়া বসবাস করেন। শ্রীহট্টে নবগ্রাম নামক স্থানে তাঁহাদের আদিবাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম কুবের পণ্ডিত ও জননীর নাম নাভাদেবী। তাঁহার সহধর্ম্মিনীর নাম ছিল সীতাদেবী। কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আত্মজ্ঞানী অদ্বৈতাচার্য্য প্রেম সাগরে মিশিবার আকাঙ্ক্ষায় শান্তিপুরে আসিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। আসামে শঙ্করদেব প্রেম ভক্তির যে অক্ষয় বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাই এই সকল মহাপুরুষের সাধনায় বহু শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া বাঙ্গালায় মহা মহীরুহে পরিণত হইয়া সমগ্র দেশবাসীর তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছিল।

বঙ্গদেশে এই সময়ে নিত্যানন্দ প্রভু জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া প্রেম ভক্তির সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর বাস ছিল রাঢ় দেশে একচক্রা গ্রামে। এই গ্রাম আধুনিক বীরভূম জেলার অন্তর্গত। তাঁহার পিতার নাম হারাই ওঝা, পিতামহের নাম সুন্দরা মল্লবাড়ুরী, মাতার নাম পদ্মাবতী। নিত্যানন্দ ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু শালিগ্রামের সূর্য্যদাস সারকেলের দুই কন্যা জাহ্নবী ও বসুধাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। জাহ্নবী দেবীর নাম বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। এই মহাদেবীর গর্ভে গঙ্গা নামে এক কন্যা ও বীরভদ্র নামে এক পুত্র জন্মে। ভগীরথাচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য (শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের পড়ুয়া) গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই মাধবাচার্য্যই সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যানুবাদ "কৃষ্ণভক্তিতরঙ্গিনী" নাম দিয়া করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্শ্বচর ছিলেন। "গৌর নিতাই" অভেদাত্মভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এই যুগল মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া থাকেন।

এই কয়েকজন বৈষ্ণব-প্রধান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাবের প্রভাবে

প্রজ্বলিত দীপ শলাকায় তৈল প্রাপ্ত ও স্বীয় প্রতিভার কৈশিক আকর্ষণে বিভাবিত হইয়া সমগ্র বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলী পাইয়া বাঙ্গালী যতি কুলের শিরোমণি হইয়া ভবিষ্য ইতিহাসের এক অদ্ভুত অপূর্ব্ব অধ্যায় খুলিয়া রাখিয়া তিরোহিত হইয়াছেন। পৃথিবীর কবিগণ ও চিত্রকরগণ আপন আপন প্রতিভার জ্বালাময়ী তুলিকায় প্রেমকে সজীব করিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করিয়াছেন—তাহাতে কত কৌশল, কত সূক্ষ্ম চিত্রকলার, কত ললিত পদের, কত কল্পনার রেখা টানিয়াছেন. মানবের ভাষা সে ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় প্রেম বিকারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মূর্ত্তিমান সজীব প্রেম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে কেবল বঙ্গেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সংসারের ঘোরতর বৈষম্যের মধ্যে যত মহাত্মা জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেহই এই বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ তনয়ের সাম্যবাদের মহত্ব স্পর্শ করিতেও পারেন নাই। লেখাপড়ার চর্চ্চা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রেণী বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সাম্যবাদ সেই গণ্ডী ভেদ করিয়া দর্শন কাব্যাদি আলোচনায় সর্ব্বসাধারণকে সমানাধিকার প্রদান করিয়া ঘোর অজ্ঞানান্ধকার হইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার করিয়াছে। তাই আজ আমরা শুনিতেছি "চণ্ডালোঽপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ।" সমাজ আজ সেই শিক্ষার আবেগে শূদ্রকেও ব্রাহ্মণোচিত সম্মানে পূজা করিয়া জ্ঞান ও গুণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

সাধনা না হইলে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। আমরা সাধনাভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়াই আমাদের মন্ত্র নির্জীব, দেবতা শিলাতে পরিণত হইয়াছে। কর্ম্ম-বিপ্লব না হইলে ধর্ম্ম বিপ্লব সংঘটিত হয় না। কর্ম্মবিপ্লব হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাবতার হইয়াছিলেন। এই গুরুতর যুগধর্ম্মের সূত্র প্রচারার্থে নবদ্বীপে এক সময়ে কয়েকজন মহা বৈষ্ণবের সম্মিলন হইয়াছিল। নদী যেমন নানা দেশ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া অবশেষে সাগরে যাইয়া আপনার জলধারা মিশাইয়া আত্মবেগ সম্বরণ করতঃ সাগরময় হইয়া যায়, তদ্রূপ এই সকল প্রেম প্রস্রবণগুলি একে একে সাগর-সঙ্গম লাভ করিবার আশায় নবদ্বীপে আসিয়া প্রেম ভক্তিসাগরে আত্ম সমর্পণ করিবার জন্য মন্ত্রপূত চক্ষে কালের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইঁহাদের আবির্ভাবে জ্ঞানালোকিত নবদ্বীপভূমি প্রেমভক্তির ক্ষীণরশ্মিকে সাদরে আলিঙ্গন

করিয়াছিল। সহসা সেই ক্ষীণরশ্মি প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র দেশের নয়ন ঝলসিত করিয়া আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সেই মহাশক্তির নাম "জীবে প্রেম, ভক্তি নারায়ণে" বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম। ইহারাই লৌকিক নাম "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"। কবি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেম-ভক্তি-পরায়ণ বৈষ্ণব কুলের এই নবদ্বীপসম্মিলনকে প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের ন্যায় মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণে অতীত ইতিহাসের একখানা উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়া, সে সময়ের বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনের লুপ্ত বীজ উদ্ধার করিয়া দেখাইতে প্যারেন কেন যুগাবতারের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল।

ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লীলা কবি বৃন্দাবন দাস প্রথম প্রচার করেন। বৃন্দাবন দাস স্বরচিত চৈতন্য ভাগবতে অবতারের সূত্র সঙ্কলনে ব্যস্ত। তিনি গীতার সেই মহতী প্রতিশ্রুতি আশ্রয় করিয়া অবতারের প্রয়োজন প্রতিপাদন করিতে যাইয়া, সে সময়ের বঙ্গের যে সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মনীতির বর্ণনা করিয়াছেন ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র সে সময়ে দেব ভাষায় লিখিত ও পঠিত হইত। মাতৃভাষা কেবল মনের ভাব প্রকাশ করিবার একমাত্র অবলম্বন হইয়া লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইত। বিদ্যালোক, জ্ঞানালোক অতি সংকীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালী জাতির বর্ণনাতীত দুর্দ্দিন উপস্থিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি অজ্ঞান তিমিরে জীবনের সমাধি করিয়া ভগবানের দিকে চাহিয়াছিল। সেই জন্য ভক্তিযোগের প্রেমমার্গের প্রচারের আবশ্যক হইয়াছিল। বাঙ্গালী তখন "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্" এই ধোকায় সন্তুষ্ট না হইয়া মন্ত্রপূত চক্ষে মহাজন খুঁজিতেছিল। সেই মহাজন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে বঙ্গ সমাজে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম ভক্তির লীলা খেলা বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম জীবনের মূল সূত্র শতাব্দীর পর শতাব্দীর অনমুশীলনে বৈদেশিক সংমিশ্রণে আজ আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। সৃষ্টির অনাদিকাল হইতে আমরা জানি, "পূজ্যেষু অনুরাগো ভক্তিঃ" আর জানি "ভক্তিরাস্তিক্যবুদ্ধিঃ" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের প্রচারিত সমগ্র মনোবৃত্তি ঈশ্বরাভিমুখীন হইলে যে ভক্তির উদয় হয়, আমরা তাহা ভুলিয়া তাহার অসার ছায়া অন্ধ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াছিলাম বলিয়াই ভক্তি যোগ চ্যুত হইয়াছিল। হিন্দুর আত্মোন্নতি ধর্ম্মে, কর্ম্মে নহে। ধর্ম্ম সাধনে যে কর্ম্মের উৎপত্তি তাহাই হিন্দুর করণীয়। এখন

কর্ম্মই ধর্ম্মের আসন পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়াই কর্ম্মাচরণ ধর্ম্মাচরণ হইয়াছে। এই কারণেই সমাজে নানাবিধ উপধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিতেছে।

সংসার কর্ম্মক্ষেত্র। এখানে কর্ম্মীরই সম্মান। কর্ম্মসূত্রে মানুষ সংসারে আসিয়া অন্যের অলক্ষ্যে বেলা থাকিতে আপন কার্য্য সাধন করিয়া যাইতে থাকেন, সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। অনেক সময় সেই কার্য্য জন্মার্জ্জিত সংস্কার বিরোধী বলিয়া সমাজ তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে থাকে। যাহা ভগবানের প্রেরণা, যাহাতে জগতের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে সে কার্য্যে মানবের বাধা বিঘ্ন কিছুই করিতে পারে না। কবি বৃন্দাবনদাস যুগাবতারের সংসার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে বঙ্গের হিন্দু সমাজের নিম্ন লিখিত চিত্রখানি অঙ্কিত করিয়া আজ বিংশ শতাব্দীতে আমাদিগের মানস চক্ষের সাম্নে আনিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন ;—

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণ পূজা কৃষ্ণ ভক্তি নাহি কারো বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহলে।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গলে॥
কৃষ্ণ শূন্য মণ্ডলে দেহের নাহি সুখ।
বিশেষ অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ভাগবতগণ।
কোথায়ও না শুনে ভক্তি যোগের কথন॥
কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহ কৃষ্ণ বলি শ্বাস ছাড়য়ে কাঁদিতে॥
অন্ন ভাল মতে কার না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি যায় দুঃখে॥
ছাড়িলেন ভক্তগণ সব উপভোগ।
অবতরিবার প্রভু করিলা উদ্যোগ॥

তান্ত্রিক হিন্দুধর্ম্ম সে সময়ে হিন্দুসমাজকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের রীতি নীতি লোকহৃদয়ে আধিপত্য করিতেছিল। ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম

বুঝিবার শক্তি লোকের বিলুপ্ত হইয়াছিল। ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে লোক প্রবৃত্তির সেবা পূজায় ডুবিয়াছিল। যাঁহারা লোক শিক্ষক তাঁহারাই তান্ত্রিক, তাঁহারাই তন্ত্রের প্রচারক সুতরাং ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুদয় সংঘটিত হইয়া সমগ্র হিন্দুসমাজকে বিক্ষোভিত করিয়াছিল। কর্ম্ম-সূত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে নবাগত ভাগবতগণ হতাশ হইয়া দেহান্তর গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছিলেন। ভক্তের সাধনার আহ্বান এরূপ অবস্থায় অরণ্যে রোদন হইতে পারে না, কাজেই প্রভু অবতীর্ণ হইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ভগবদ্ভক্ত কবি বৃন্দাবনদাস অবতারবাদের অতি সূক্ষ্মতম সূত্র সংকলন করিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন সাধকের মত ভক্তিপূর্ণ প্রাণে আমরা ডাকিতে পারিলে প্রভু থাকিতে পারিবেন না, আবার অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রভু উদ্যোগ করিবেন। ইহাই বিশ্বাসী হিন্দুর অবতারবাদ। ভক্ত হৃদয়ে এই ভাবে ভগবান প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে অবতীর্ণ হইতেছেন, পরম ভাগবতগণ আত্মরতিতে তাহা সন্দর্শন করিয়া হরি! হরি! হরি! বলিয়া ভবসিন্ধু পারে যাইতেছেন, আমরা বধির তাই শুনিতে পাইতেছি না।

এই সময়ে বঙ্গের নানাস্থানে ভাগবতগণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে কৃষ্ণধ্যানে নিয়োজিত ছিলেন। খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে আকাশে নক্ষত্র বিশেষের উদয় দেখিয়া খৃষ্টের পূর্ব্বগামী ভক্তগণ যেমন তাঁহার জন্মের সংবাদ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দর্শনাশায় বহু দূর দেশ দেশান্তর হইতে "বেথেলহেমে" খৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইরূপে সে সময়ের হরিভক্তগণ যেন ধ্যানে যুগাবতারের নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হইবার কথা জানিতে পারিয়া সকলে আসিয়া পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর তীরে একত্র হইয়াছিলেন। কবি বৃন্দাবনদাস এই ভাগবতগণের নবদ্বীপে আগমন ব্যাপার গঙ্গা-যমুনার সম্মিলনের ন্যায় মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বহু শতাব্দীর ব্যবধান হইলেও আজ আমরা তাঁহাদের জীবনের ক্ষুদ্র একখানি আলেখ্য কবির কৃপায় উজ্জ্বলভাবে দর্শন করিতেছি ঃ—

"কোন মহা প্রিয় বৈসে জন্ম অন্য স্থানে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ ধামে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য পূজিত॥

ভবরোগ বৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান।
চৈতন্য বল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হৈল ইহা সবার পরকাশ।
বুড়ণে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥
রাঢ় দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যথাবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈল ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সবে হইল মিলন॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥

[চৈতন্য ভাগবত বৃন্দাবন দাস]

এই ভাবে জ্ঞানের লীলাভূমি নবদ্বীপে ভক্তবীরগণ একত্রিত হইয়া জ্ঞান ভক্তির কথা প্রচার করিতেছিলেন—সংসারের অলীকতা সপ্রমাণ করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের বীজ নবদ্বীপের উর্ব্বরভুমিতে রোপণ করিয়াছিলেন। অলক্ষ্যে সে বীজ প্রথিত হইয়াছিল, অলক্ষ্যে সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। লোক-চক্ষুর বাহিরে সে বীজ বহু শাখা প্রশাখায় পরিণত হইয়া হিন্দু জাতির ও হিন্দু সমাজের জাতীয় উন্নতির বৈজয়ন্তীরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। যে সকল আত্মবিবেকী মহাপুরুষগণ এই নবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে অমর হইয়া গিয়াছেন—আজও মানব প্রতিভা তাঁহাদের যশঃসৌরভের কণিকা মাত্রও কালের হিল্লোলে প্রবাহিত করিতে পারে নাই। হীন-শক্তি বাঙ্গালী হিন্দু, আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি হারাইয়া সে সৌরভ গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে। এই কারণে মন্ত্রশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে, দেবতা শিলাতে পরিণত হইয়া সাধককে পশুধর্ম্মী করিয়াছে। দেশের দুর্ভাগ্য বলিয়াই লোকে বৈষম্যের বন্ধন ছিন্ন করিয়া নামশক্তিতে মোক্ষের উদ্ধার উদ্‌ঘাটিত থাকিলেও প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না।

এইরূপে আদ্রিতে নবদ্বীপধামে মহাবৈষ্ণব সম্মিলন হইলে ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে যুগাবতারের আবির্ভাব নবদ্বীপে হইয়াছিল। সেদিন সহসা রাহু

গগনের পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিয়া লোককে বলিয়া দিয়াছিল সংসারের পূর্ণচন্দ্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে জগতের অমঙ্গলান্ধকার গ্রাস করিয়া ত্রিভুবন আলোকিত করিয়াছে। মানব জ্ঞান চক্ষুতে পৃথিবী সন্দর্শন করিতেছে বাহিরের আলোকের আর প্রয়োজন নাই। সেই চন্দ্রগ্রহণের দিনে লক্ষ লক্ষ নর নারী পবিত্র জাহ্নবীর জলে অবগাহন করিতে করিতে "মুরজ মন্ত্রে" শ্মশান ভূমি পবিত্র করিয়া পাপীকে পরিত্রাণ করিতে মধুর তানে যে হরিবোলধ্বনি করিয়াছিল। তাহাই মানব হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর তারকব্রহ্ম নামে অনন্ত পথগামীর পথের সম্বল হইয়াছে। কবি কৃত্তিবাস যথার্থই বলিয়াছেন, স্বর্গের বৈষ্ণবগণ যে দিন জাহ্নবীর জলে স্নান করিবেন সেই দিন পাপতাপ হারিণী ভাগীরথী উদ্ধার হইবেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর যুগবতারের আবির্ভাবের সহিত মিলিয়া বৈষ্ণবগণ নবদ্বীপ প্লাবিত করিয়া কিশোরীর প্রেম সংগীতে নদীয়া ভাসাইয়াছিলেন সেই গঙ্গার মাহাত্ম্য লোক নয়নগোচর হইয়াছে। লোকে বুঝিতে পারিয়াছে গঙ্গা প্রেম-বারিধারা, ঐরাবতকেও প্রেম বন্যায় ভাসাইয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন। জড় প্রাণে এই ভাবে প্রেমবারিধারা সিঞ্চন করিয়া বৈষ্ণবগণ মোক্ষদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন। সাধনা মার্গে সাধক তাহাতে নিমজ্জিত হইয়া প্রতিদিন এই নব-নায়ত্রীয় প্রচার করিতেছেন বলিয়া আজও হিন্দুধর্ম্ম আপন গৌরবে জগতে সুপ্রতিষ্টিত আছে।

আমরা কবি বৃন্দাবন দাসের মহা-কাব্য হইতে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি, সে সময়ে যুগাবতারের প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়াছিল। কবি বৃন্দাবন দাস বিধবার সন্তান। নির্ভীক সাধক কবি, আপন জন্মবৃত্তান্ত গোপন না করিয়া দেখাইয়াছেন "জাবালী" একজন হিন্দুসমাজে নাই। আমরা কবির ভাষায় কবির অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত এখানে প্রকটিত করিয়া দেখাইতেছি যে হিন্দুর সত্য প্রীতি কতদূর প্রবল ছিল। পরবর্ত্তী কবিগণ বৃন্দাবন দাসকে বেদব্যাসের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ২২ বৎসর পর তাঁহার জন্ম হয়। সে সময়ে নবদ্বীপে কৃষ্ণ প্রেমের ঘোর তুফান উঠিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব তখনও গৃহাশ্রমী। তখন ও তিনি গৃহে থাকিয়াই কৃষ্ণ-প্রেম প্রচার করিতেছিলেন। এক দিন শ্রীবাসের গৃহে পরম ভাগবত

গণের সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব সেই মহাসভায় আপন "গণ" বা পার্শ্বচরগণ সহ বিরাজ করিতে করিতে—

আপন গলার মালা দিলা সভাকারে।
চর্ব্বিত তাম্বুল আজ্ঞা হইল সভারে॥
মহানন্দে খায় সবে হরষিত হৈঞা।
কোটী চন্দ্র শারদ মুখের দ্রব্য পাঞা॥
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ সুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব করে তারে আশীর্ব্বাদ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ॥
বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥
খাইলে, প্রভুর আজ্ঞা হয় নারায়ণী॥
কৃষ্ণের পরমানন্দে কাঁদ দেখি তুমি॥
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
কৃষ্ণ বলি কাঁদে অতি বালিকাস্বভাব॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণব মণ্ডলে যার ধ্বনি॥
চৈতন্যের অবশেষ পাত্রী নারায়ণী॥

[চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড]

নিত্যানন্দের বরে মহাপ্রভুর চর্ব্বিত পানের অবশিষ্টাংশ খাইয়া বিধবা নারায়ণী গর্ভবতী হইয়া যে পুত্র প্রসব করেন, সেই পুত্রই বৈষ্ণব সমাজে বৃন্দাবন দাস নামে খ্যাত। বৃন্দাবন দাস ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে তিরোহিত হন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর তিনি চৈতন্যভাগবত লিখিতে আরম্ভ করেন। আদি, মধ্য ও অন্ত এই তিনখণ্ডে ভাগবত সমাধান করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন দাস খেতুরের বৈষ্ণবমহাসম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন এবং ব্যাস যোগ্য পূজাও পাইয়াছিলেন। এই ভাগবতে মহাপ্রভুর অন্তর্লীলা পরিস্ফুট রূপে বর্ণনা না থাকায় ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের আদেশে কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করিয়া সে অভাব পরিপূর্ণ করিয়াছেন। এখানে একটি কথা বলা-

আবশ্যক। হিন্দুর জন্মার্জ্জিত সংস্কারে বলিয়া দেয় মানবের বুদ্ধি, মানবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। মানব জ্ঞানাতীত অলৌকিক জ্ঞান আছে, যাহা দর্শন বিজ্ঞান ও ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জ্ঞানের অতীত। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞেয় ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টা করি এবং সেই নিস্ফল চেষ্টাকে একমাত্র অবলম্বন করিয়া সংসারের প্রতি কার্য্যের, প্রতি দৃশ্যের বিচার করিয়া জ্ঞানগৌরবে স্ফীত বক্ষ হইয়া আপনার প্রধান্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকি। এইজন্য বৃন্দাবন দাসের এই জন্ম বৃত্তান্ত আমাদের নিকট অবিশ্বাস্য! গৌড়ের নিকট রামকেলী গ্রাম আছে। এই গ্রামে পরম বৈষ্ণব রূপ ও সনাতন বাস করিতেন। এই দুই মহা পুরুষ সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। উভয়েই গৌড়ের বাদশাহ সরকারে উচ্চ রাজ কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। রামকেলী সে সময়ে নবদ্বীপের ন্যায় বিদ্যাস্থান না হইলেও বিদ্বজ্জন সমাগমে ভারতে বিখ্যাত ছিল। রূপ সনাতন পণ্ডিতগণের সম্মান করিতেন এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। রূপ-সনাতন কর্ণাটাধিপতি বিপ্ররাজের বংশধর। এই বংশের পদ্মনাভ নৈহাটীতে গঙ্গাতীরে আপন বাসস্থান স্থাপন করেন। ইহার পুত্র কুমারদেব বাখরগঞ্জ জেলার বাকলা চন্দ্রদ্বীপে ফতেয়াবাদ নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। কুমার দেবের পুত্র—সনাতন গোস্বামী, রূপগোস্বামী। ১৪৮৮ হইতে ১৫৫৮ ও ১৪৬৯—১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রূপসনাতন জীবিত ছিলেন। ইঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। তাঁহার অপ্রকটের তারিখ আমরা জানিতে পারি নাই। শ্রীজীব গোস্বামীর আদেশমত গ্রন্থরাজি লইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। কবিবর নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার নরোত্তম-বিলাসে রূপ সনাতন ও রামকেলীর নিম্নলিখিত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম পরিগ্রহণ করিয়া দেশে দেশে প্রেম বিলাইয়া বেড়াইতে ছিলেন সেই সময় তিনি রূপ সনাতনের আহ্বানে একবার রামকেলীতে পদার্পণ করিয়া এতদ্দেশ পবিত্র করিয়া ছিলেন।

"গৌড়ে রামকেলিগ্রাম অপূর্ব্ব বসতি।
তথা রূপ সনাতন গোস্বামীর স্থিতি॥
মহারাজ মন্ত্রী সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ।
সদা শাস্ত্র চর্চ্চা লৈয়া অধ্যাপকগণ॥
মহারাষ্ট্র কর্ণাটক দ্রাবিড় তৈলঙ্গ ।

উৎকল মিথিলা গৌড় গুজরাট বঙ্গ ॥
কাশী কাশ্মীর আদি স্থিত মহাবিদ্যাস্থান।
যাঁহার সমাজে হয় সভার সম্মান ॥
সনাতন রূপ গৌড় রাজ প্রিয় অতি।
ঐশ্বর্য্যের সীমা সে আশ্চর্য্য সবরীতি ॥

* * * *

সন্ন্যাস করিলা প্রভু নীলাচলে গিয়া।
বৃন্দাবন চলে প্রিয় ভক্তে প্রবোধিয়া ॥
প্রভুর দর্শনে লক্ষ লক্ষ লোকধায় !
ঐছে রামকেলি আইলা গৌড় রায় ॥

* * * *

একদিন প্রভু নিত্য প্রিয়গণ লৈয়া।
নাচে সংকীর্ত্তনে মহা প্রেমে মত্ত হৈয়া !
নিরখিয়া শ্রীখেতরি গ্রাম দিশা পানে।
অদ্ভুত আনন্দ ধারা বহে দুনয়নে ॥
"নরোত্তম" বলিয়া ডাকে বারে বারে।
ভক্ত বাৎসল্যেতে স্থির হইতে না পারে ॥ নরোত্তম বিলাস

এইরূপে কবি নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রায় শত বৎসর পর যে "মহা বৈষ্ণব সম্মিলন" রাজসাহী জেলায় পদ্মানদীর তীরে হইবে, তাহার সূত্র রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার পর তাঁহার প্রেম শক্তি মূর্ত্তিমান হইয়া ভক্ত-মন্দিরে যে মহা পীঠস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন, আজও খেতুরের মেলা-রূপে তাহা দেশে দেশে ঘোষিত হইয়া প্রেম বিজয়ের পতাকা উড়াইয়া বঙ্গ বাসীকে হরি ! হরি ! হরি ! বলিয়া ভবসিন্ধু পারে লইবার জন্য সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছে। অতীতের সাক্ষী ইতিহাস আপনার বক্ষে সেই সকল লুপ্ত স্মৃতি ধারণ করিয়া হীনধর্ম্ম হিন্দুকে বলিয়া দিতেছে "উঠ, জাগ একবার প্রেম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জগতে আপনার প্রেম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা কর।"

বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাস লেখক কবিবর নরহরি চক্রবর্ত্তী। তাঁহার সময়ে যদি গদ্যে লিখিবার রীতি থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় তিনি আর পয়ারের আশ্রয় লইয়া পদ্যে তাঁহার ইতিহাস গুলি সঙ্কলন করিতেন না। নরহরি সুস্পষ্ট ভাবে দেখাইয়াছেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব গণ আধুনিক বৃন্দাবনের সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাঁহারাই আধুনিক বর্ত্তমান লুপ্ততীর্থ গুলির আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহার ব্রজ পরিক্রমা ও নবদ্বীপ পরিক্রমা খাঁটি ঐতিহাসিক স্বর্ণ। কবিবর ভক্তি রত্না-কর গ্রন্থে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে ;
পূর্ব্ব বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘন শ্যাম॥
গ্রহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহা পাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রদিন॥
দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষ্ণব গোঁসাই।
বেদে গায় তুয়া কৃপা বিনা গতি নাই॥

বোড়াকুলীর মহোৎসবে প্রেমোন্মত্ত সাধক ভক্ত শ্রীনিবাস আচার্য্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নরহরি ব্রজধামে গমন করেন। ব্রজবাস কালে তিনি "ব্রজ পরিক্রমা" গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহাতে আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। ভক্তি রত্নাকরই নরহরির সর্ব্বস্ব।

এখানে আর ও কয়েক জন বৈষ্ণব কবির পরিচয়ের প্রয়োজন। ইঁহা-দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর পার্শ্বচর গোবিন্দদাসকে সর্ব্ব প্রধান বলা যাইতে পারে। মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পদ্যে পয়ার ছন্দে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া চৈতন্য দেবের জীবনের "Auto Biograhhy" রাখিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দ দাস মহা প্রভুর দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের যে ভৌগলিক বিবরণ দিয়াছেন, তাহা চৈনিক ভ্রমণকারীগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতেও উজ্জ্বল। খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দীর দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম বিশ্বাসাদি যেভাবে তিনি প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকের অতি আদরের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় করচায় মাত্র দুই বৎসরের ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। ১৫১০ খৃঃ ৭ই বৈশাখ বা ২১ শে এপ্রেল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব দাক্ষিণাত্য অভিমুখে রওনা হন ও ১৫১১ খৃঃ ৩রা মাঘ বা ২০ শে জানুয়ারী পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। সুতরাং এই ভ্রমণ ব্যাপার এক বৎসর আটমাস

২৬ দিনে সমাধা হইয়াছিল। মুরারী গুপ্ত সর্ব্ব প্রথম সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য লীলা লিখিয়াছিলেন। গোবিন্দ দাস স্বাধীন ভাবে আপনার করচা খানি লিখিয়াছেন। গোবিন্দ দাসের পিতার নাম শ্যাম দাস কর্ম্মকার। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে আপন বাসস্থান কাঞ্চন গড়িয়া (বর্দ্ধমান জেলায়) গ্রাম হইতে আপনার স্ত্রীর নিকট "মূর্খ" "নির্গুণ" আদি বাক্যে তিরস্কৃত হইয়া মনের খেদে বৈরাগ্য ভাবাপন্ন হন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মহা প্রভুর সহিত মিশিয়া যান।

গোবিন্দ দাসের পর জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল নাম দিয়া ভাষায় মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল" খানি খাঁটি ঐতিহাসিক স্বর্ণ। জয়ানন্দের পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দন এই বংশের কীর্ত্তিস্তম্ভ। জয়ানন্দের বাল্য নাম ছিল "গুইয়া"। মহাপ্রভু পুরী হইতে বর্দ্ধমান আসিবার কালে সুবুদ্ধির বাটীতে শুভাগমন করেন এবং সেই সময়ে সুবুদ্ধির পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন ':জয়ানন্দ"। জয়ানন্দের আর কোনও গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় নাই। জয়ানন্দের মাতার নাম ছিল রোদনী। জয়ানন্দ নবদ্বীপে মোছলমান দৌরাত্ম্যের যে ছবি আঁকিয়াছেন' তাহা আর কোন ও সম সাময়িক কবির গ্রন্থে পাওয়া যায় না। নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র ও গদাধর পণ্ডিতের আজ্ঞায় জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল রচনা করেন। জয়ানন্দ প্রাচীন কবিগণের একটী তালিকা তাঁহরে গ্রন্থমধ্যে দিয়া সুদূর অতীতের ঘোর অন্ধকারতটে একটী প্রদীপ জ্বালিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছেন :—

শ্রীভাগবত কৈলাব্যাস মহাশয়।
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার।
চৈতন্য চরিত আগে করিল প্রচার ॥
চৈতন্য সহস্র নাম শ্লোক প্রবন্ধে।
সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে ॥
শ্রী.পরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে।
সংক্ষেপ করিল তেঁহি গোবিন্দ বিজয়ে ॥

আদ্যখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড করি।
বৃন্দাবন দাস রচিল সর্ব্বোপরি ॥
গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি ॥
সংক্ষেপ করিলেন তেঁহি পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গ বিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥
গোপালবসু করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে।
চৈতন্য মঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে ॥
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে।
জয়ানন্দ সংগীত মঙ্গল গায় শেষে ॥ জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ আমরা অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই, বটতলার ছাপাখানার মুখ এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থরাশি দেখিতে পায় নাই। কালের প্রভাবে অগ্নি ও কেতাবকীটের মুখে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যচর্চার ফলে হজম পাইয়াছে। উত্তরকালের লোকের নিকট আর অন্য পরিচয় দিবার উপায় নাই।

এই সমস্ত সমসাময়িক কবিগণ আপনাদের চক্ষে সমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া এবং স্বয়ং সেই সকল ঘটনায় উপস্থিত থাকিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া আপন আপন গাথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কল্পনার লীলাখেলা তাহাতে স্থান পায় নাই, ভাষার ওজস্বীতা তাহাতে রঙ ফলাইতে পারে নাই। সরল বর্ণনায় ভক্তিরস উছলিয়া উঠিয়া লেখক ও পাঠককে পবিত্র করিয়াছে। সাধকের সাধনা, ভক্তের ভক্তি, কর্ম্মীর কর্ম্ম এখানে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া মানসচক্ষে তৃপ্তি ও পরিসমাপ্তির যে চিত্র অঙ্কন করিয়া দেখাইতেছে, ভাষায় আর কোনও শ্রেণীর কবি তাহা দেখাইতে সমর্থ কি না আমরা জানি না। এই সকল মহাপুরুষের কীর্ত্তিকথা অমৃত সমান বলিয়া আজও মানবজাতি সুখে পাঠ করিতেছে। যদি বঙ্গের পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস কখনও লেখা হয় তাহা হইলে এই সকল কবির দর্শনচক্ষুর পরিদৃষ্ট দৃশ্যগুলি ভাষার পরিচ্ছদ হইতে বাছিয়া লইয়া লিখিত হইবে।

বাঙ্গালায় যে প্রেমপ্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়া বঙ্গবাসীকে আপ্লুত করিয়াছিল তাহার ঢেউ যাইয়া উৎকলে প্রেমসাগরে পরিণত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাঙ্গালা ছাড়িয়া শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথধামে বিচরণ করেন। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে দেখাইয়াছেন একদিন মহামহোৎসবে সংকীর্ত্তন করিতে

করিতে মহাপ্রভুর পায়ের অঙ্গুলীতে আঘাত লাগে, তাহাই বিষম হইয়াছিল। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তেরা সে দৃশ্য আঁকিতে অক্ষম। ভাষায় তাঁহারা সে কথা প্রকাশ করিতে পারেন না। বাঙ্গালার সেইদিন অতি দুর্দ্দিন। সেই দিন রাহু আসিয়া আবার যে নদীয়ার চাঁদকে গ্রাস করিয়া অমানিশার ঘোর অন্ধকারে সমগ্রদেশ গ্রাস করিয়াছে, আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইলেও ঘুচিল না। আত্মহারা বাঙ্গালী সাধনায় সিদ্ধি আছে সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এখন ঘোর কর্ম্মবিপ্লবের মধ্যে পতিত হইয়া আপন আপন কর্ম্ম ভুলিয়া বিজাতীয় কর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া সকলেই শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আজ পৃথিবীর মনস্বীগণ ধরাতলে মানবজাতির এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কত যত্ন, কত চেষ্টা করিতেছেন— আর আমরা আমাদের মূলসূত্র তারকব্রহ্ম নাম থাকিতে বিরাট বৈষম্যের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া ধর্ম্মপথ সংকীর্ণ হইতেও সূক্ষ্মতর, জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া করিতেছি। ভেদজ্ঞান এক অসীম সাগর-আকারে সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া অতি দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাকাররূপে আমাদের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। স্বেচ্ছাচারী, অনাচারী বা ভ্রষ্ট হইয়াও আমরা সে পরিখা অতিক্রম করিতে ইচ্ছুক নহি। ইহা হইতে আর আত্মপ্রবঞ্চনা কি হইতে পারে? জাতীয় অধঃপতন আর কাহাকে বলে।

যে মহাপুরুষ বর্ত্তমানকে অতীতের কঠোরতম শাসন হইতে উদ্ধার করিয়া ইতিহাসে সে বিপ্লবকাহিনী মধুররূপে কীর্ত্তন করাইয়া উজ্জ্বলতরভাবে চিত্রিত করাইয়াছেন, যিনি পশুমুণ্ড, নানাবিধ ব্যয়সাধ্য উপকরণাদি আমাদিগকে ত্যাগ করাইয়া প্রেমভক্তি ও নয়নাশ্রু দ্বারায় দেবপূজা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, যাঁহার মুখরিত তারকব্রহ্মনাম মাত্র আমরা আমাদের অন্তিমের সম্বল করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের কৃপায় সকল জাতি সমভাবে বিদ্যার্জ্জন করিয়া বঙ্গভাষাকে কবির "মুকতা যৌবনে" দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে, সেই দেবরূপী মনুষ্যের নির্ম্মল প্রেমাশ্রু বারিতে আমরা আমাদের হৃদয়ের আবিলতা বিধৌত করিয়া, সেই অন্তিমের মহামন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বৈষ্ণব মহাসম্মিলনের পবিত্রদিনের ন্যায়, কবির সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শিখিয়াছি "এক জাতি এক ধর্ম্ম এক সিংহাসন" (রৈবতক)। ইহাই বিংশ শতাব্দীর নবগায়ত্রী, ইহাই এ যুগধর্ম্মে প্রেমভক্তি। ক্রমশঃ

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

ভাগবত ধর্ম্ম।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে শ্লোকটি আলোচনা করা হইয়াছে তাহার সার মর্ম্ম এই যে আমরা যে ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করি না কেন, যদ্যপি হরিকথায় রতি না জন্মায় তাহা হইলে সকলেই বিফল। এই কথাটির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমেই দেখা দরকার, হরিকথায় রতি, বলিতে কি বুঝায়? মানব চিত্ত কি ভাবে ভাবিত হইলে হরিকথায় রতি জন্মায়? সর্ব্বাগ্রে এই দুটি প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন। কথার দ্বারাই বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, কথা চিন্তার বা অন্তরের মূর্ত্তি। জগতে অসংখ্য বস্তু, স্থূল ও সূক্ষ্ম, তাহাদের মধ্যে অসংখ্য প্রকারের সম্বন্ধ বিদ্যমান, কথার দ্বারাই আমরা এই বস্তু ও সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া থাকি। এই যে বস্তু ও সম্বন্ধময় বিশ্ব, ইহা শূন্য হইতে উদ্ভূত নহে, ইহার মূলে ও ইহার মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে শ্রীভগবান রহিয়াছেন। বিশ্ব একটি লীলা বা খেলা; বিশ্বনাথ লুকাইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি। তাঁহাকে পাইতে হইবে বা তাঁহাকে ভাল বাসিতে হইবে, ইহাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা জড় বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া স্থূল বস্তু সমূহের ধর্ম্ম ও সম্বন্ধ লইয়াই আলোচনা করি, আর মনস্তত্ব লইয়া চিন্তার সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম রহস্যেরই আলোচনা করি, আর সমাজতত্ত্ববিৎ; বা ঐতিহাসিক হই, আমাদের আলোচনা যতক্ষণ সেই এক আনন্দময় পরম পুরুষের স্বরূপের পরিচয়ে আমাদিগকে লইয়া যাইতে না পারিবে, ততক্ষণ জানিতে হইবে আমরা আমাদের আলোচনার যাহা প্রকৃত উপসংহার তাহা জানিতে পারি নাই।

শ্রীভগবানের নাম, গুণ, লীলা শ্রবণে ও কীর্ত্তনে মানবের কেবল সেই অবস্থায় রতি হয়, যে অবস্থায় তিনি সকল বস্তুর, সকল কার্য্যের ও সকল সম্বন্ধের মূলে শ্রীভগবান রহিয়াছেন, এই টুকু বুঝিতে পারেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে অবস্থায় মানব বুঝিতে পারেন যে 'প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন, অন্য কোনরূপ চরম লক্ষ্য আছে বলিয়া যে আমরা মনে করি এবং কোন কোন শাস্ত্রকার আমাদিগকে সেইরূপ উপদেশ দেন তাহা ভুল। শ্রীভগবান এই প্রেমের বিষয়, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহেন, এই দুইটি তত্ত্বের সহিত পরিচয় না হইলে "হরি কথায় রতি" যে সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না।

গতবারে যে শ্লোকটি আলোচনা করা গিয়াছে তাহার পরের তিনটি শ্লোকে এই দুইটি তত্ত্ব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, আমরা সেই শ্লোক তিনটির আলোচনা করিতেছি—

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে।

শ্লোক কয়েকটির অর্থ এই। কেহ কেহ বলেন ধর্ম্মের ফল অর্থ, অর্থের ফল কাম, কামের ফল ইন্দ্রিয় প্রীতি। এই জন্যই লোকে ধর্ম্ম করিয়া থাকে। ধর্ম্ম করিলে ধনী হইব, মানী হইব, অনেক ভোগের বস্তু পাওয়া যাইবে, ভোগের শক্তিও বাড়িয়া যাইবে, বেশ নিরাপদে ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধন করা যাইবে।

ধর্ম্ম সাধনের এইরূপ আদর্শ বোধ হয় অধিকাংশ লোকের মধ্যে এখনও রহিয়াছে। শ্রীবৃন্দাবন দাস কৃত শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে একটা উপাখ্যান আছে যে একবার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ললিতপুর নামক স্থানে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত। তাঁহারা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য দেবকে (এই ঘটনা তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে, সুতরাং নিমাই পণ্ডিতকে বলাই ঠিক।) আশীর্ব্বাদ করিলেন ধন হোক্ পুত্র হোক্, সংসারে সুখ হোক্।' গৌরাঙ্গদেব বলিলেন "ঠাকুর একি আশীর্ব্বাদ করিলে, এত আশীর্ব্বাদ নয়, এতো অভিশাপ।' সন্ন্যাসী অবাক হইয়া বলিলেন 'বেশ লোকতো তুমি, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম, তুমি বলিতেছ এ আশীর্ব্বাদ নয়।'

গৌরাঙ্গদেব বলিলেন 'আশীর্ব্বাদ করুন, ভগবানে ভক্তি হউক, আর কিছু প্রয়োজন নাই।

সন্ন্যাসী এই কথার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উপহাস করিয়া বলিলেন 'ভগবানে না হয় ভক্তি হইল, কিন্তু খাইবে কি?'

এই সন্ন্যাসী যাহা বলিয়াছিলেন, সাধারণতঃ আমাদের মনে এই কথাই জাগিয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে বলিয়াছেন যে মার্কিণ

মুলুকের লোকেরা জীবন ভোগ করিতে চায়, ঐশর্য্য ও বিলাস চায়, তাহাদিগকে যদি সেই সব ধর্ম্ম সাধনার কথা বলা যায় যাহাদ্বারা ভোগের বস্তু ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বস্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে, তাহা হইলে তাহারা আগ্রহ করিয়া শুনিবে। এই যে কথাটা কেবল কিছু পাইতে চাওয়া'র অবস্থা ইহা ভাগবত ধর্ম্মের নিম্নের অবস্থা। অবশ্য ইহার অর্থ এ নয় যে যিনি ভাগবত ধর্ম্মের উপাসক, ইহজীবনে যাহাকে সুখ ও ভোগ বলে, তাঁহার তাহার কিছুই থাকিবে না, ইহার অর্থ এই যে তিনি এ সকল কিছু চাহেন না; আসিয়া উপস্থিত হইলে ভগবানের কৃপার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু পার্থিব ভোগ সুখের বাঞ্ছা তাঁহার নাই।

সম্প্রতি দেখিলাম একজন ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তি ভালরূপ চাকুরী বাকুরী জোগাড় করিতে না পারিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তিনি বই লিখিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন যে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় ভোগ করিবে অথচ স্বাস্থ্যহানি হইবে না, ইহার সহজ উপায় ও সাধন আমার নিকট আছে, তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করা যায় না, যাঁহারা ইচ্ছুক তাঁহারা আমার নিকট আসিয়া এই সাধন লইতে পারেন। এই কথা প্রচার হওয়ার পর সন্ন্যাসীর অসংখ্য শিষ্য জুটিয়া গিয়াছে এবং তিনিও শিষ্যদের অর্থে নিজের ভোগবাসনা, যাহা অন্য উপায়ে চরিতার্থ করিতে পারেন নাই, তাহা চরিতার্থ করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্মের এই পুনরুত্থানের নামে এই সর্ব্বনাশকর ধর্ম্মবিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, শুদ্ধাভক্তির আদর্শ প্রচার ব্যতিরেকে, এই ভাগবত ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্যে মানবকে দীক্ষিত করিতে না পারিলে, এই যে ধ্বংসের পথ, যাহা আশ্রয় করিয়া দেশ সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা হইতে পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই।

প্রেম ছাড়া ধর্ম্ম হয় না। নিজকে বিলাইয়া দেওয়াতেই আনন্দ। এই তত্ত্বটুকু যিনি না বুঝিয়াছেন তিনি ভাগবত ধর্ম্মের অধিকারী নহেন, তিনি যুগধর্ম্মের তত্ত্বও অবগত নহেন, অর্থাৎ তিনি অপধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বিনাশের দিকে চলিয়াছেন। মস্তকে দীর্ঘ জটা, কোপীন পরিধান, কাঁটার উপর শুইয়া অথবা ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুণ্ডে তপস্যা করিতেছে, তাহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করা হইল 'বাপু সরল চিত্তে বল দেখি, তোমার এই সাধনা করার লক্ষ্য কি' প্রথমটা বলিতে চাহিল না শেষে তাহার কেমন সুমতি হইল, সে সত্য কথা বলিল। সে বলিল 'মহাশয়, আমি অতিশয় দরিদ্র, সংসারে থাকিতে পারিতে

পাইলাম না। অন্যান্য সকলে কেমন পরম সুখে আছে। গুরুদেব বলিলেন ‘এই তপস্যা কর, ইহার ফলে হয় এই জন্মে নতুবা পর জন্মে তুমি রাজা হইবে।’ আর একজন এইরূপ অবস্থায় বলিয়াছিল ‘একজন লোককে সে অন্ধ করিতে চায় এই জন্যই তাহার এই তপস্যা।’ এই গেল সাধু সন্ন্যাসীর কথা।

এইবার গৃহস্থ লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন ঐ একজন দেশ বিখ্যাত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভারি নাম, হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দেশের কত কল্যাণ করিয়াছেন। তিনি হোম করিবেন চণ্ডীপাঠ করিবেন, দক্ষিণা একশত টাকা লইবেন! এই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য কি? আমি আমার প্রতি-বাসীর নাম এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছি, এই মোকদ্দমায় যদি জয়লাভ করিতে পারি তাহা হইলে প্রতিবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইবে আর আমার যে এত কালের জাতক্রোধ তাহারও তৃপ্তি হইবে। ইহাই ধর্ম্ম!!! দেশের অধোগতির জন্য, আমাদের এই সর্ব্বনাশের জন্য কেহই দায়ী নহে, এই অপধর্ম্মই ইহার কারণ।

মাথায় জটা বাঁধিয়া বনে বসিয়া কাঁটায় শুইয়া তপস্যা করিয়া রাজা হইতে চেষ্টা না করিয়া, ঘুটেগিরি করিয়া স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করিয়া, সন্ধ্যায় হরিনাম কর, হরিকথা শ্রবণ কর, কাতর প্রাণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বল, প্রেম দাতা প্রেম দাও, এই ভোগলালসা এই দুষ্পূরণীয় কাম ও তাহার জননী অবিদ্যা পিশাচীর হস্ত হইতে রক্ষা কর; সাধ্যমত পরের হিত চেষ্টা কর প্রকৃত কল্যাণ হইবে, ইহাই ভাগবত ধর্ম্ম, ইহাই যুগধর্ম্ম। আমাদের প্রকৃত হিত এই সাধনাতেই সিদ্ধ হইবে, অন্য উপায় নাই। এইবার মূল শ্লোক কয়টির অর্থ বিচার করা যাউক।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি কথা একসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়। আদিতে ধর্ম্ম ও শেষে মোক্ষ, এই মোক্ষের আর একটী নাম অপবর্গ সুতরাং ধর্ম্মের সহিত অপবর্গের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। অর্থ ও কাম ইহারা লক্ষ্য নহে, একটা বিশেষে কিছু করিবার উপায় মাত্র।

অতএব যাঁহারা বলেন যে ধর্ম্মের ফল অর্থ আর অর্থের ফল কাম, আর কামের ফল ইন্দ্রিয়প্রীতি অতএব ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করা যাউক, তাঁহারা ভুল কথা বলেন। ইন্দ্রিয়প্রীতিই কি কামের ফল? আমাদের মধ্যে নিজের ইন্দ্রিয় প্রীতির জন্য একটা ইচ্ছা আছে, সেই ইচ্ছার নাম কাম। আমাদের মধ্যে কাম আছে, এবং ইন্দ্রিয় প্রীতির ইচ্ছা ও আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়

প্রীতিতে কি কামের নিবৃত্তি হইবে? যাঁহারা বিজ্ঞ, সত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় হইয়াছে তাঁহারা বলিবেন, না ইন্দ্রিয়প্রীতি মাত্রই কামের প্রয়োজন নহে। এই যে কাম যাহা আমাদের মধ্যে নিত্যকাল বিদ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে অভাব পূরণের জন্য চেষ্টান্বিত করিতেছে, এই কাম ইন্দ্রিয় প্রীতির দ্বারা তৃপ্তও হয় না, বরং কেবল ইন্দ্রিয়প্রীতির জন্য চেষ্টান্বিত থাকিলে অভাব আরও বাড়িয়া যায়। অভাব মিটাইবার জন্য চেষ্টা করি, ইন্দ্রিয়ের যাহাতে প্রীতি হয় তাহার প্রচুর অয়োজন করি, কিন্তু অভাব মেটেনা, মনু বলিয়াছেন—

'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে॥

কাম্য বস্তুর উপভোগের দ্বারা কামের নিবৃত্তি হয় না, জ্বলন্ত আগুন নিভাইবার জন্য তাহাতে ঘৃত ঢালিলে যেমন নিভাইবার পরিবর্ত্তে ঐ আগুণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয় প্রীতির দ্বারায় কাম আরও বাড়িয়া যায়। আমাদের সকল শাস্ত্রেই এই এককথা।

যেমন ভগবদ্গীতা বলিতেছেন—

'বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।'

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পীড়াদি নিবন্ধন অথবা আহারাদির অভাবে নিরাহার হয়, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় গুলি শিথিল হইয়া বিলীনপ্রায় হয় বটে কিন্তু তাহাতে বিষয়ানুরাগের বা কামপীড়ার অনুমাত্রও ক্ষয় হয় না।

তাহা হইলে কামের তাৎপর্য্য কি? ইন্দ্রিয়প্রীতি নহে। ভাগবত বলিতেছেন 'লাভো জীবেত যাবতা' শ্রীধর স্বামী টীকায় বলিলেন 'জীবন পর্য্যাপ্ত পর্য্যন্ত কাম সেব্য ইত্যর্থঃ' সংক্ষেপে ইহার অর্থ বিচার করা যাইতেছে। আমরা সকলেই বাঁচিয়া থাকিতে চাই, মনের দুঃখে সময়ে সময়ে বলি বটে, 'যম হে আমাকে লইয়া যাও" 'আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই ফণী ধ'রে খাই হলাহল'। কিন্তু যম যদি ডাক শুনিয়া হঠাৎ একদিন মহিষের উপর চড়িয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে আমরা কথামালা'র কাঠুরিয়ার মত যমকে কাঠের বোঝা মাথায় তুলিয়া দিতে অনুরোধ করিব। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই' কেহই মরিতে চায় না। তবে যে কেহ কেহ আত্মহত্যা করে সে একটা উন্মাদের অবস্থা। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহার কারণ এই, জীবনে যতই দুঃখ পাইনা কেন, জীবনের মূলে আনন্দ সর্ব্ব

দাই আছে, গভীর দুঃখের সময়েও সেই আনন্দ উপস্থিত। 'আনন্দেন জাতানি জীবন্তি"। আমরা অমৃতের পুত্র, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই। এখন বাঁচি কি করিয়া? তত্ত্বদর্শী বলিবেন 'কেন, আমি তো আত্মা, আমার তো মরণ নাই।' তত্ত্বদর্শীর কথা সত্য। কিন্তু আমি যখন বলি যে আমি আত্মা তখন কথাটা সত্য হইলেও আমার মিথ্যা কথা বলা হয়। কারণ আমার তো প্রতীতি নাই যে আমি আত্মা। তাহা হইলে আমাকে এখন বাঁচিতে হইলে, এই দেহ খানি রাখিতে হইলে কাম চাই। কামনা (Desire) না থাকিলে আমাদের সঙ্গে জড়বস্তুর কোনই প্রভেদ থাকিত না, কামের দ্বারা চালিত হইয়াই আমরা চেষ্টান্বিত, 'আমি আমার, আমাকে বাঁচিতে হইবে' এই চিন্তাই এখন আমাদের চেষ্টান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, এই চেষ্টার দ্বারাতেই আমরা নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বিকাশের পথে যাইতেছি। সুতরাং কাম একটা নিরর্থক ব্যাপার নহে, এই বিশ্ব লীলায় কামদেবের কাজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন। মদনকে দহন করিলে চলিবেনা। তবে ক্রমে ক্রমে মদনকে মোহন করা যায় কিরূপে তাহারই চেষ্টা করা যাইবে। সাধনার সনাতন আদর্শ মদন দহন নহে, মদন মোহন, একথা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব।

তাহা হইলে বুঝিতে পারা গেল জীবন ধারণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু কামের সার্থকতা এবং যথার্থ ভাবে জীবন ধারণ হইতেছে কিনা তাহা আলোচনা করিয়া কামদেবের পূজা করিতে হয়। সহজ কথা এই যে যেটুকু শরীর রক্ষার জন্য দরকার সেইটুকু খাইবে, কেবল কামের বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অমিতভোজন করিবে না, কারণ তাহা হইলে জীবনী শক্তির বিকাশ না হইয়া ফল তাহার বিপরীত হইবে। এই প্রকারে সকল জায়গাতেই কামের সেবা করিতে হইবে।

এইবার প্রশ্ন হইতেছে যে কামের ফল জীবন ধারণ, এখন জীবন ধারণের ফল কি? একদল লোক সেই আগের কথা বলিলেন। ধর্ম্ম কর্ম্মদ্বারা যে স্বর্গাদিলোক পাওয়া যায় সেই লোক পাওয়া কামের ফল। ভাগবত বলিতেছেন, না, তাহা নহে। জীবন ধারণের ফল তত্ত্ব জিজ্ঞাসা।

তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই তত্ত্বজিজ্ঞাসা কি, তাহা আমরা পরে দেখিব। শ্রীমদ্ভাগবত অন্যস্থানে এই জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলে পরবর্ত্তী শ্লোকের যাহা প্রতিপাদ্য তাহার বেশ সুন্দর আভাস পাওয়া যাইবে।

"তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কি গ্রামে পশবোঽপরে ॥
শ্ববিড়্ বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপাথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥
বিলে বতোরু ক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটেনরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥
ভারঃ পরং পট্ট কিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্ল্লসৎকাঞ্চন কঙ্কণৌবা ॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরানাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ণ নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেনুন্ ন জাতু মর্ত্ত্যোভিলভেত যস্ত।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্ত ন বেদগন্ধং ॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যগৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রেজলং গাত্ররুহেষুহর্ষঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ২স্ক ৩র্থ।

এই শ্লোকগুলির অর্থ এই। আমরা যে এই জগতে আছি, ইহার উদ্দেশ্য কি? কেহ বলিবেন খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই জীবনের উদ্দেশ্য। শাস্ত্র বলিতেছেন শুধু বাঁচিয়া থাকা, সে তো গাছেরাও থাকে। কিন্তু আমরা যে নিশ্বাস ফেলি? শাস্ত্র বলিতেছেন ভস্ত্রার মধ্যেও তো নিশ্বাসের মত বায়ু যাতায়াত করে। কেহ বলিবেন আমরা আহার করি সন্তান উৎপাদনাদি করি। শাস্ত্র বলিতেছেন পশুগণও তাহা করে। তাহা হইলে আমরা যে মানুষ হইয়াছি আমাদের বিশিষ্টতা কি? অচেতন পদার্থ, উদ্ভিদ ও পশু হইতে আমরা পৃথক কিসে?

শাস্ত্র বলিতেছেন—কৃষ্ণনাম যাহার কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, সে মানব একাই চারিটি গর্হণীয় পশুর কার্য্য সাধন করে। এই চারিটী পশু কি কি? কুক্কুর গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ। একা মানুষ চারিটি পশুর ধর্ম্মপালন করে বলিয়া পশুগণ সেই মানুষপশুর স্তব করে। পশুগণ এই কথা বলে যে আমরা পশু, কিন্তু একজন অপরের ধর্ম্ম লইতে পারি না। আর আমরা স্বধর্ম্মে অবস্থিত। কিন্তু এই যে মানুষ, এ ব্যক্তি ইহারা স্বধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া নরক হইবে তাহা জানিয়া আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে আর অনুরাগের বশবর্ত্তী হইয়াই সে পরমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে ও বিধির শাসনে নহে।

পরন্তু অনুরাগের দ্বারা আমাদের চারি জনের ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে। কুকুরের ধর্ম্ম অকারণ রুষ্ট হওয়া, শূকরের ধর্ম্ম অমেধ্য ভোজন, উষ্ট্রের ধর্ম্ম কণ্টকের ন্যায় দুঃখপূর্ণ বিষয়াসক্তি, আর গর্দ্দভের ধর্ম্ম ভারবহন। তাঁহা হইলে শাস্ত্রকার বলিতেছেন শ্রীভগবানের কথা শ্রবণে যদ্যপি রতি না হয়, তাহা হইলে মানুষ পশু অপেক্ষাও হীন। ভগবত কথায় রতিই মানব জীবনের লক্ষ্য। নিখিল বিশ্বব্যাপারে, এই পরিবর্ত্তন প্রবাহের মূলে আনন্দময় পরম পুরুষ তাঁহার স্বরূপের মধুর লীলায় মত্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই লীলাময়কে একমাত্র সত্য ও আপনার জন বলিয়া আশ্রয় করিতে হইবে, ইহাই জীবনের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে এই কথাই বলা হইল।

এই যে ভগবানকে পাওয়া বা একমাত্র সত্য ও আপনার জন বলিয়া, কেবল শাস্ত্রের উপদেশে নহে বা কোনরূপ স্বার্থ বুদ্ধির প্রেরণায় নহে, স্বভাবের প্রেরণায়, ঐকান্তিক অনুরাগে যে আশ্রয় করা, তাহা যে কেবল মাত্র একটা চিন্তা বা কল্পনা তাহা নহে, ভগবানকে আমাদের সমগ্র সত্ত্বা দিয়া আপনার করিতে হইবে। দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সমস্তই তাঁহার; আলোচ্য শ্লোকে তাঁহার নাম শ্রবণই কর্ণের সার্থকতা, এইটুকু উল্লেখ করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহাই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন।

'যে মানব শ্রীকৃষ্ণের গুণানুবাদ শ্রবণ না করে, তাহার দুইটি কর্ণরন্ধ্র বৃথা ছিদ্রমাত্র, আর যে ব্যক্তি ভগবানের গাথা গান না করে তাহার দুষ্ট জিহ্বা ভেকজিহ্বার তুল্য।' কর্ণেরন্ধ্র দুইটীকে গর্ত্ত বলার তাৎপর্য্য এই যে গ্রাম্যবার্ত্তারূপ যে সর্প তাহা তথায় বসতি করে।

'যে মস্তক মুকুন্দ চরণারবিন্দে প্রণত না হয়; তাহা পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কিরীটে সজ্জিত হইলেও কেবল ভার মাত্র; আর যে দুই হস্ত হরির সপর্য্যা না করে তাহা কঞ্চন কঙ্কনে দেদীপ্যমান হইলেও সেই দুই হস্ত মৃত ব্যক্তির হস্ত তুল্য।' কিরীট ও উষ্ণীব শোভিত মস্তককে ভার বলার তাৎপর্য্য এই যে জলে ডুবিয়া যাইবার সময় যদ্যপি মস্তকে কোনও গুরুভার দ্রব্য থাকে তাহা হইলে আর নিস্তারের উপায় থাকে না, সেইরূপ উষ্ণীষ ও কিরীটে মস্তক শোভিত থাকিলে অর্থাৎ জগতে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও যদি বিশেষ ভাবে ভগবদুপাসনা না করা যায়, তাহা হইলে সংসার সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা খুব অধিক। হস্ত দুইটীকে মৃতব্যক্তির হস্ত বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই, যে হস্ত দুইটী অপবিত্র, দৈব ও পৈত্র কার্য্য তাহার দ্বারা হয় না।

'যাহাদের চক্ষু দুইটি ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন না করে, তাহা ময়ুর পুচ্ছের সদৃশ, বস্তুতঃ তাহার কোন কার্য্যকারিতা নাই, আর যে দুই পদ হরিক্ষেত্রে গমন না করে, সেই দুই পদ বৃক্ষের মত।' চক্ষুকে ময়ূর পিঞ্ছের তুল্য বলার প্রয়োজন এই যে ইহা আত্মার উদ্ধার সাধন করেনা, কেবলমাত্র সংসার কণ্টকক্ষেত্রে পতিত হয়। চরণ দুইটী বৃক্ষের মত অর্থাৎ যমদূত-গণ কুঠারের দ্বারা তাহা ছেদন করিবে।

'হে সূত যে মনুষ্য কখন ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু ধারণ না করে, সে ব্যক্তি জীবচ্ছব অর্থাৎ জীবিত থাকিয়াও মৃত, আর যে শ্রীবিষ্ণুর পদলগ্না তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আনন্দিত না হয়, সে নিশ্বাস সত্ত্বেও মৃত শরীর সদৃশ।'

মানব এই প্রকারে ভগবানকে অনুভব ও আস্বাদন করিয়া বাহ্য অঙ্গ সমূহের সার্থকতা সাধন করিবে। কিন্তু কেবল তাহা হইলেই হইবে না, অন্তর অঙ্গ সমুহের ও ভগবদুপাসনাদ্বারা সার্থকতা সাধন করিতে হইবে। হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে ও বিকার হইলেও যদি নেত্রে অশ্রু ও গাত্রে লোমাঞ্চ না হয়, তাহা হইলে সে হৃদয় পাষাণ-তুল্য কঠিন।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে এই এক অপূর্ব্ব ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে যে কোন স্থানের উপদেশ আলোচনা করিলেই ভাগবত ধর্ম্মের যাহা আদর্শ তাহা মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। জীবনে ধর্ম্ম যখন প্রতিষ্ঠা ও বিকাশলাভ করে, সেই সময়ে জীবন কিরূপ হয় তাহা পূর্ব্বের শ্লোকগুলি হইতে একরূপ বুঝা যাইতেছে। ধর্ম্মজীবনের একটা আদর্শ আছে তাহা এইরূপ শিক্ষা দেয় যে আমাদের এই দেহ ও ইন্দ্রিয় পরমার্থের বিরোধী অর্থাৎ ইহারা আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের বিঘ্ন স্বরূপ। ভাগবত ধর্ম্ম তাহা বলেন না। ভাগবত ধর্ম্মে অবশ্য দেহ সুখ বা ইন্দ্রিয় সুখ উদ্দেশ্যরূপে উপদিষ্ট হয় নাই, ভাগবত ধর্ম্মে এই কথা বলা হয় যে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যখন আমরা আমাদের ছোট আমিটিকে আশ্রয় করি তখনই দুঃখ পাই, কিন্তু এই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানকেও আশ্রয় করা যায়। দেহ ও ইন্দ্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম করিতে হইবে না, তাহাদের দ্বারা ভগবানের উপাসনা বা সেবা করিতে হইবে, ইহাই প্রকৃত কথা।

সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কীর্ত্তি।

বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান, প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাস্থান শ্রীনবদ্বীপ ধামে সাধু শ্রীনিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ফাল্গুন মাসে 'শ্রীশ্রীরাধারমণ সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কিঞ্চিদধিক একবৎসর পরে ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে 'মাতৃমন্দির' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩২১ সালের বৈশাখ মাস হইতে নিদাঘ বিদ্যালয়ের কার্য্য হইয়াছে। নিদাঘ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য কলিকাতায় একটি ছাত্রাবাস খোলা হইয়াছে। শ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীমৎ নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের শ্রীধাম নবদ্বীপে এই তিনটী কীর্ত্তি।

এই তিনটী সদনুষ্ঠানের দ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সাধিত হইতেছে।

(১) অন্ধ, আতুর, অসহায় ও স্থবির ব্যক্তিগণকে আশ্রয়দান ও প্রতিপালন।

(২) দরিদ্র রুগ্ন ব্যক্তিগণকে অসহায় অবস্থায় আশ্রয়দান করিয়া চিকিৎসা করা ও অন্যস্থানে থাকিলে চিকিৎসকের সাহায্য দান ও ঔষধ পথ্য প্রদান।

(৩) অসহায় মৃত ব্যক্তির সৎকারাদি করা।

(৪) বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের সময় রোগীগণকে বিশেষরূপে সেবা ও সাহায্য করা।

(৫) বিদেশী যাত্রীগণের সর্ব্ব প্রকার অভাব ও অভিযোগ দূরীকরণ।

(৬) ক্ষুধিত বিপন্ন ব্যক্তিগণকে অন্নদান।

(৭) অনাথ বালকগণকে রক্ষা ও তাঁহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(৮) বিদেশ হইতে আগত অসহায় প্রসূতিগণকে সাহায্য করা ও ভ্রূণহত্যা নিবারণ।

(৯) শিক্ষিত যুবকগণকে শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম্মের সহিত পরিচিত করা।

(১০) বিবিধ উপায়ে শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার করা।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীমন্ নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার নামে নবদ্বীপ ধামে যে সম্পত্তি ছিল তাহার তত্ত্বাবধান ও তাঁহার কীর্ত্তি রক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল সলিসিটার কলিকতা।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু শরৎ চন্দ্র সিংহ জমীদার, রাইপুর, বীরভূম।

(৩) শ্রীযুক্ত বাবু কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ, বীরভূমি সম্পাদক ও ধর্ম্ম প্রচারক।

(৪) শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী ধর্ম্মপ্রচারক।

(৫) শ্রীযুক্ত বাবু মানিকলাল মল্লিক ব্যবসায়ী কলিকাতা।

(৬) শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসন্ন বাক্‌চি জমিদার নবদ্বীপ।

(৭) শ্রীযুক্ত বাবু গোপীকৃষ্ণ চন্দ্র বি, এ, হেড মাষ্টার হিন্দুস্কুল, নবদ্বীপ।

ট্রাষ্টিগণের অভিমত অনুসারে অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত বাবু কুলদা প্রসাদ মল্লিক পূর্ব্বোক্ত তিনটী অনুষ্ঠানের সম্পাদক হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী সেন ও শ্রীযুক্ত বাবু সুধাময় চট্টোপাধ্যায় সহযোগী সম্পাদক হইয়াছেন। এই তিন জন এক্ষণে আশ্রমের সমুদয় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপে যে সৎকার্য্যগুলি আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি সম্বন্ধে স্বদেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই ধীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন, তাঁহারা এখন প্রায়ই এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমাদের বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপ ধাম হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্য দেব ও তাঁহার পার্ষদগণ কর্ত্তৃক যে প্রেম ধর্ম্মের উজ্জ্বল ও মধুর আদর্শ জনসমাজে প্রচারিত হয়, সেই প্রেমধর্ম্মে বাঙ্গালীর জীবনের প্রকৃত সার্থকতা ও একমাত্র কল্যাণসম্ভাবনা নিহিত আছে। এই প্রেমধর্ম্মকে এখন আর সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম বলিয়া সুধীগণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। এই প্রেমধর্ম্ম বাঙ্গালার জাতীয়ধর্ম্ম। আজ সমগ্র জগত যে বিশ্বজনীন মহা ধর্ম্মের আশার স্বপ্নে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে শ্রীমন্ মহাপ্রভুই সর্ব্ব প্রথমে এই বঙ্গদেশে সেই প্রেমধর্ম্মের আনন্দ-বার্ত্তা প্রচার করেন এবং স্বয়ং আস্বাদন করিয়া জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে আস্বাদন করাইয়া যান। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি, চারিশত বৎসর পূর্ব্বের সেই অপূর্ব্ব সংবাদ এতদিন ভুলিয়া বসিয়াছিলাম আজ আবার তাহা ভগবানের বিশেষ কৃপায় মনে পড়িয়া গিয়াছে।

মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও আমাদের জীবনে তাহা প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই; সিদ্ধ মহাত্মা চরণ দাস বাবাজী মহাশয় কি করিয়া এই প্রেমধর্ম্ম আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে সে সম্বন্ধে সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন এবং সে বিষয়ে তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেন। তাঁহারই উপদেশক্রমে সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই সৎকার্য্যগুলি আরম্ভ করেন। শ্রীধাম নবদ্বীপই এই প্রেমধর্ম্মের কেন্দ্র ও সর্ব্বপ্রধান তীর্থ। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাস্থান এই নবদ্বীপ ধামের গৌরবে প্রত্যেক বাঙ্গালী গৌরবান্বিত, সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী নবদ্বীপে আসিয়া

থাকেন। এই প্রেমধর্ম্ম যে জীবে দয়া বা জনসেবার মধ্য দিয়া সর্ব্বাগ্রে আপনাকে সফল করিয়া থাকে, এই তত্ত্বটুকু কার্য্যের দ্বারা জনসমাজে প্রচার করিয়া, ধর্ম্মের নামে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা দূর করা আবশ্যক। ইহা ছাড়া মঙ্গলের অন্য উপায় নাই। সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই ভাবের প্রেরণাতেই পূর্ব্বোক্ত কার্য্যগুলি আরম্ভ করেন। এ প্রকারের কার্য্য নবদ্বীপে এই প্রথম, আশা করি এই কার্য্যগুলি সম্বন্ধে সকলে ধীর ভাবে চিন্তা করিবেন।

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ মাতৃমন্দির।

(১৩২১ সালের ১১ই আষাঢ় "সঞ্জীবনী" হইতে পুনর্মুদ্রিত)

গত বৎসর মে মাসে সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় কর্ত্তৃক স্থানীয় রাধারমণ সেবাশ্রমের শাখা-রূপে এই ভবন প্রতিষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপে এই প্রকারের ভবন প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তিই বহুদিন হইতে অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু কার্য্যটি দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য বলিয়া পূর্ব্বে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে নদীয়ার সর্ব্বজনপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্, সি, মুখার্জি মহোদয়ের সভাপতিত্বে কৃষ্ণনগর টাউনহলে এই মাতৃমন্দির সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাবধারণ করিবার জন্য যে মহতী সভার অধিবেশন হয়, সেই সভায় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর বলেন যে নবদ্বীপে প্রতি বৎসর নানা স্থান হইতে প্রায় ৬০০ জন গর্ভবতী স্ত্রীলোক আসিয়া থাকেন।

এই সমস্ত স্ত্রীলোক বিধবা, তাহারা গর্ভবতী হইয়া সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে নবদ্বীপে আসিয়া থাকে ও গোপনে গর্ভ নষ্ট করে, অনেকে সন্তান প্রসূত হওয়ার পর মৃদু বিষ প্রয়োগ করিয়া অথবা অত্যন্ত অযত্ন করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া থাকে। কন্যা সন্তান হইলে বেশ্যাগণ তাহাদিগকে কিনিয়া লয় এবং ভবিষ্যতে এই সমস্ত বালিকা জীবিকার জন্য বেশ্যাবৃত্তি করিয়া থাকে। এই ঘটনা, যাহা নিত্য নিত্য গোপনে ঘটিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। গর্ভবতী বিধবাগণকে সহায়তা করা এক সম্প্রদায় লোকের অর্থ উপার্জ্জনের একটি বিশিষ্ট উপায়। এই সম্প্রদায়ের লোকও সমাজে আদর ও সম্মানের সহিত,

হয়ত গুরু বা ধর্ম্মপ্রচারক সাজিয়া বাস করেন। ইহা ছাড়া অসৎ লোকের হস্তে পড়িয়া গর্ভবতীগণের আরও অনেকরূপ লাঞ্ছনা হইয়া থাকে। এই ব্যাপার দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, কিন্তু ইহার প্রতিকার সাধনে মনোযোগী হইতে আমাদের সাহস হয় নাই। অনেক সময়ে এমনও হইয়া থাকে যে একজন গর্ভবতী আসিয়া কোন সরাইবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে, সরাই বাড়ীর অধ্যক্ষ গর্ভবতীর টাকা কড়ি সমুদয় আত্মসাৎ করিয়া প্রসবের পূর্ব্বে তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়।

নিত্যানন্দ দাস মহাশয় এই সমুদয় জানিতেন এবং বিপদ হইতে আশ্রয়হীনা স্ত্রীলোক ও সদ্যপ্রসূত শিশুগণকে রক্ষা করার জন্য তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি লইয়া রাখিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালের ১ লা এপ্রিল তারিখে নিত্যানন্দ দাস মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করেন ও ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি প্রদান করিয়া স্থানীয় হেল্‌থ অফিসার ও পুলিশ সাব্‌ইন্‌স্পেক্টারকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য আদেশ করেন।

সারাইবাড়ী হইতে বিতাড়িতা ও আশ্রয়হীনা একটি গর্ভবতী স্ত্রীলোক একদিন রাত্রিকালে নবদ্বীপের এক জঙ্গলে সন্তান প্রসব করিয়া রোদন করিতেছিল, নিত্যানন্দ দাস মহাশয় সেই সময়ে ট্রেণ হইতে নামিয়া সেবাশ্রমে আসিতেছিলেন। তিনি সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া এই স্ত্রীলোকটিকে সদ্যপ্রসূত শিশু সহ রাধারমণ সেবাশ্রমে আশ্রয় প্রদান করেন ও সেই দিন হইতেই এই মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে কিছুদিন সেবাশ্রমেই গর্ভবতী ও শিশুগণকে রাখা হইত, শেষে নানা কারণে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে ও নবদ্বীপ ধর্ম্মশালার বৃহৎ বাড়ী এই উদ্দেশ্যে ভাড়া লওয়া হয়। এখনও সেই বাড়ীতেই মাতৃমন্দিরের কার্য্য চলিতেছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ই তারিখে মাঘী মেলায় অক্লান্তভাবে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত রোগীর সেবা করিতে করিতে স্বয়ং বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া নিত্যানন্দ দাস মহাশয় মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি উইল করিয়া নবদ্বীপধামে তাঁহার নামে যে সম্পত্তি ছিল সেই সমুদয় সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ট্রাষ্টি নিযুক্ত করিয়া যান। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কলিকাতা) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সিংহ ঐ শ্রীযুক্ত মাণিকলাল মল্লিক ঐ শ্রীকুলদা প্রসাদ মল্লিক ঐ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী

ঐ, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাগচী (নবদ্বীপ) শ্রীযুক্ত গোপীকৃষ্ণ চন্দ্র (ঐ)। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক সেবাশ্রম ও মাতৃমন্দিরের সম্পাদক হইয়া এই দুইটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন।

মহাত্মা নিত্যানন্দ দাস মহাশয় মাতৃমন্দিরের কার্য্য আরম্ভ মাত্র করিয়া গিয়াছিলেন। পরিচালনার আনুপূর্ব্বিক ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক মহাশয় কৃষ্ণনগরে নিত্যানন্দ দাস মহাশয়ের কীর্ত্তিরক্ষা, বিশেষ করিয়া মাতৃমন্দির রক্ষা করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে কয়েকদিন বক্তৃতা করেন। কৃষ্ণনগরের যাবতীয় সহৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তিই বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। স্থানীয় অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী, কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার প্রভৃতি ভদ্রলোকগণের বিশেষ চেষ্টায় মাতৃমন্দিরের কার্য্য পরিচালনার জন্য কৃষ্ণনগরে একটি কমিটি গঠিত হয়। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এই কমিটির সভাপতি, কৃষ্ণনগরের মহারাজা ইহার সহযোগী সভাপতি, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রভূষণ চক্রবর্ত্তী ইহার সম্পাদক। নবদ্বীপে কার্য্য পরিচালনার জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছে সেই কমিটিতে স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত তারা-প্রসন্ন বাগচি মহাশয় সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক সম্পাদক। ইঁহারা উভয়েই রাধারমণ সেবাশ্রমের ট্রাষ্টি। রাধারমণ সেবাশ্রম কর্ত্তৃকই এই মাতৃমন্দির পরিচালিত হয়, কৃষ্ণনগর কমিটি মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া মে মাস হইতে সাহায্য করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে আশ্রমে ৮টি শিশু, ৩টি প্রসূতি ও শিশু পালনের জন্য ৫ জন ধাত্রী আছেন। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিগণকে তিন মাস রাখা হয়। গত মে মাসে এই মন্দিরে সর্ব্বসমেত ১৩২৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কৃষ্ণনগর কমিটি ৫০ টাকা দিয়াছেন, আর অবশিষ্ট ব্যয় রাধারমণ সেবাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রদান করিয়াছেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও সবডিবিসনাল অফিসার এই মন্দির, মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন করিয়া থাকেন। ইঁহারা ছাড়া গত এক মাসের মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার, মহারাজা শ্রীযুক্ত ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, পণ্ডিত শিবনারায়ণ শিরোমণি ও নবদ্বীপস্থ অন্যান্য পণ্ডিতগণ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, মিষ্টার উইটেন্ বেকার, ডাক্তার কাইমুরা

(জাপান) শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ দত্ত (অধ্যাপক পাবনা) ডাক্তার গয়ানাথ পাল (জগতী) প্রভৃতি এই মন্দির পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ১ লা এপ্রিল তারিখে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ দাস মহাশয় নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যে আবেদন করেন সেই আবেদন পত্রের এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, ইহা হইতে আশ্রমের উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

People from all parts of the province, especially from Dacca, Mymensing. Tippera and other districts of East Bengal, throng into this city (Nabadvip) seek shelter just to hide their shame under the shade of the multitudious population and the pecuniary greediness of the Sarai-keepers of Navadvip, deliver these off-shoots from illicit connections, bide their time and they depart again to avoid calumny and disgrace to their respective homes, leaving the unfortunate infants to their fate.

These children often die for sheer neglect and wilful carelessness on the part of the mothers and the inn-keepers, as it is generally against their interest and intention to preserve the lives of these babies. And even if they survive, the babies, if girls, are frequently handed over to the ignominous women— destined by the so.called parents themselves to life-long prostitution and wretched debase-ment. The boys likewise recommended to beggarism aed vagabondism all the days of their lives to move about in low circles and and in low company, without education and without breeding, so that they have no other alternative but to grow up into a race of ruffians and rascals.

With a view to prevent, as far as possible this lamentable state of affairs—to keep these poor, helpless, fateless children out of the imminent wreck and ruin of so many human lives—to provide them with food, lodging, and suitable education, so that they may push up their heads and stand out as men in the strife aad sruggle of life in the world, this institution craves the permission of the official staff and the active co-operation of the local police in the working and management of Delivery Home, where secrecy and care of the babies delivered will be guaranteed.

মাতৃমন্দির ও সেবাশ্রম সম্বন্ধে একটি কথা বলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান কোনও সম্প্রদায় বিশেষের নহে। এই আশ্রমে যাঁহারা থাকেন তাঁহারা স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মমতের অনুবর্ত্তন করিতে পারেন। এই আশ্রমে যে উপদেশ দেওয়া হয় তাহা সার্ব্বজনীন। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সাধু নিত্যানন্দ দাস মহাশয় উদার ভক্তিপথের সাধক ছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে যে বিশেষ অভাব দূর করিবার জন্য মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অভাবের গুরুত্ব প্রায় সকলেই অনুভব করেন, কিন্তু কেবল মাত্র অনুভব করিলেই চলিবে না। সকলেই এই আশ্রমকে সাধ্যমত সাহায্য করুন। যাবতীয় সাহায্য শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক সম্পাদক সেবাশ্রম, নবদ্বীপ পোঃ নদীয়া, এই ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন।

---

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও ১৭ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন হইতে শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।